অমানিশার আলোকমালা

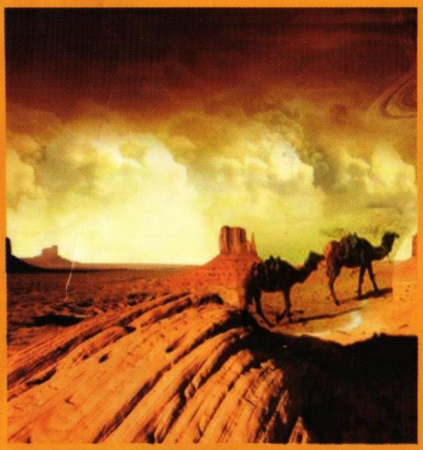

বদরুজ্জামান

অমানিশার আলোকমালা

বদরুজ্জামান

আহসান পাবলিকেশন
ঢাকা

www.pathagar.com

অমানিশার আলোকমালা

বদরুজ্জামান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৭৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল
জানুয়ারী, ২০১১
সফর, ১৪৩২
মাঘ, ১৪১৭

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাক্স কম্পিউটার
৩১১ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা), ঢাকা
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

Omanishar Alokmala by Badruzzaman Published by Ahsan Publication Kataban Masjid Campus, Dhaka First Edition January, 2011 Price Taka : 40.00 only.

www.pathagar.com

লেখকের কথা

'বদর থেকে বালাকোটে'র পর 'অমানিশার আলোকমালা' বেরুলো। এতে ইসলামের ইতিহাসের উন্মেষ পর্বের চৌদ্দজন সাহাবার ইসলাম গ্রহণের পূর্বাপর ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে। কথা সাহিত্যের আকারে তাঁদের পরিবেশ, পেশা, জনজীবনে তাঁদের সম্পৃক্ততা ও জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তাঁদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা, মহান আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও রাসূলের (সা.) প্রতি ভক্তি-ভালবাসার বিষয়কে অনুভবের আঙিনায় আনতে চেষ্টা করেছি। জানি না প্রিয় পাঠক-পাঠিকা কীভাবে তা গ্রহণ করবেন।

বইয়ের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দিয়েছেন অধ্যাপক এস.এম. হারুন-উর-রশীদ। বইয়ের বক্তব্যের উৎস, ব্যাপ্তি ও পরিকল্পনার অনেক কথাই এতে প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অপরিশোধ্য।

বই প্রকাশে নানা প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যাকে নিজের করে নিয়ে সবকিছুই নিরসন করার চেষ্টা করেছে অনুজ প্রতিম মু. ইকবাল বাসার (ইবনে সিনা, ঢাকা) এবং মোঃ আবুল হোসেন। তাদের এ সহযোগিতার কথা কখনোই বিস্মৃত হবার নয়। বন্ধুবর আব্দুল মজিদ সব সময় প্রেরণা ও সাহস দিয়েছে। তাই তার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বইটি আহসান পাবলিকেশন থেকে মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভাই প্রকাশ করেছেন। তাই তাকেও সহস্র ধন্যবাদ।

পরিশেষে, এ বই পাঠের মধ্যদিয়ে পাঠক ইসলাম, রাসূল (সা.) ও সাহাবাদের জীবনকে আরো অন্তরঙ্গভাবে ভাবতে পারবেন, এই প্রত্যাশা রইলো।

তারিখ : ০৮/১০/২০১০ (খ্রি.)

বদরুজ্জামান
জাফরপুর, তারালী
কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা

www.pathagar.com

অবতারণিকা

নিঃসীম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেই আলোর দিশারী। যাঁর আলো জ্যোতির্ময়– মহান প্রভুর আলোয় আলোকিত। আদিগন্ত ছড়ানো তাঁর দ্যুতি, যাঁর স্পর্শ সর্বত্রগামী। হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত। মরুময়, ঊষরভূমি আরবের এই উজ্জ্বল আলোর মানুষটি ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। যাঁর আবির্ভাবে আলোকিত হয়েছে সে সময়কার অগণন মরুচারী বেদুঈন মানব-মানবী। যাঁদের আজীবন লালিত অবিশ্বাসী হৃদয়ে এসেছে তৌহিদের স্বচ্ছ বোধ ও বিশ্বাস। সেই সঙ্গে মনুষ্যত্ব ও মানবতা বোধকে উদারভাবে গ্রহণ করার অদম্য ইচ্ছা। ইসলামের সূচনাপর্বে তাঁদেরই কয়েকজন বিশ্বাসী ও রাসূল প্রেমিক সাহাবীদের নিভৃত জীবনের কথা নিয়েই সাজানো হয়েছে এ বইয়ের সংক্ষিপ্ত কলেবর।

হেরার নিঝুম-নিভৃত গুহাবাস থেকেই রাসূল (সা.) কালিমার দাওয়াত দেয়ার জন্য আদৃষ্ট হয়েছিলেন। কম্পিত কায়া আর অস্থির অন্তর নিয়ে রাসূল ফিরে এলেন স্বগৃহে। প্রিয়সঙ্গিনী, প্রিয় সহধর্মিণীর কাছে। সেই মহান সত্তার অনুভবের কথা, সেই জ্যোতির্ময় বাণীবাহকের মধুর আলিঙ্গনের কথা, স্পষ্ট শব্দ ধ্বনি 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি'র কথা সবিস্তরে বললেন তাঁকে। পরম প্রভুর বন্ধুতা, তাঁর দ্বীন প্রচারের দায়বদ্ধতা তাঁকে আরো ব্যাকুল করে তুললো। তাইতো বুদ্ধিমতী জীবনসঙ্গিনী স্বামীকে নিয়ে গিয়েছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ চাচাত ভাই আরাকা বিন নওফেলের কাছে। নিরসন হলো সমস্যা, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের। তাওরাত ও ইঞ্জিলে পণ্ডিত প্রবর বৃদ্ধ স্বীকার করলেন নবুয়তকে, তাঁর রিসালতকে চিহ্নিত করলেন দীপ্ত কণ্ঠে। যাত্রা শুরু হলো। কিন্তু এ যাত্রার পথ সুগম ছিলো না। ছিলো দুর্গম, কণ্টকাকীর্ণ। নিজের একান্ত জীবনসঙ্গিনী হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রা.) এ পথের সাথী হলেন। গ্রহণ করলেন ইসলাম। সমগ্র মুসলিম নর-নারীর মধ্যে ইসলামের চির-শান্তির আলোয় আলোকিত হলেন। এরপর থেকে একে একে কিশোর আলী (রা.), পুত্র প্রতিম গোলাম যায়েদ (রা.), বন্ধুবর আবু বকর (রা.) এই স্নিগ্ধ-কুসমিত ধর্মে দীক্ষা নিলেন। তারপর অন্যান্য সাহাবা।

www.pathagar.com

অনুজতুল্য বদরুজ্জামানের এটি চতুর্থ প্রকাশনা। 'বদর থেকে বালাকোটে'র উদ্দীপনা ও উৎসাহ যেনো উচ্চারিত হয়েছে তাঁর এ গ্রন্থের জীবন ঘনিষ্ঠ রচনাগুলোতে। এসব লেখায় যুদ্ধের ঘটনা -পরম্পরার চিত্র নেই, আছে প্রিয় মানুষের সান্নিধ্যে আসার অপার ইচ্ছা। প্রভুর প্রিয়তম রাসূলের (সা.) কাছে আত্মসমর্পণ করার চিরায়ত ব্যাকুলতা। কিন্তু তাঁর হাতে দীক্ষা নেবার পরও কারো কারো জীবন চলার পথ আরো সমস্যা-সঙ্কুল, আরো রক্ত-পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে। যারা আরব সমাজে অন্ত্যজ, ব্রাত্য, নিঃস্ব ক্রীতদাস, তাদের অবস্থা আরো শোচনীয় রূপ ধারণ করেছে। নিঃসম্বল ক্রীতদাসের শরীরটাও তো তার নয়, মালিকের। ভাবলে অবাক লাগে, সে কিছুই নয়, একেবারে নিঃস্ব, নিজের বলতে তার কিছুই নেই এ পার্থিব সংসারে, তার জন্য ইসলাম গ্রহণ সবচে' সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলাল– খাববাব এঁদের প্রতিনিধি। মালিক তাঁদের অবিশ্বাসী, রাসূলদ্রোহী, পুতুল পূজাতে মগ্ন যাদের অসুস্থ চৈতন্য। তাদের জুলুমের হাত থেকে রেহাই পায়নি এই দাসত্বের নিগড়ে বাঁধা মজলুম সাহাবারা। বেলাল– খাববাবদের আর্ত-চিৎকারে মরুর বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। নিস্তব্দে দাঁড়িয়ে থাকা খেজুর গাছটিও যেনো তাঁদের রক্তাক্ত শরীর দেখে নীরবে আহাজারি জানিয়েছে। লেখক এখানে ইসলামের ইতিহাসের উন্মেষ পর্বের এসব ক্রীতদাস সাহ-াবাদের রক্তাক্ত বেদনাময় ঘটনার কোন কোন দৃশ্যকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন। একটি বেদনার্ত মানুষের মুখের দৃশ্যকে শব্দ ও ধ্বনির ব্যঞ্জনায় মুখর করে তুলেছেন। আমার বিশ্বাস তাতে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা অন্তঃত একটি করুণদৃশ্যের অনুভবকে আয়ত্ত করতে পারবেন, আর ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণতার পথ যে সুগম ছিলো না তা-ও অনুমান করা সহজ হবে। সময় ও সমাজের বিপ্রতীপ প্রভাব কতোটা প্রতিকূল ছিলোতা বোঝা যাবে। এককথায়, ইসলামের ইতিহাসের সূচণা লগ্নের চৌদ্দজন সাহাবার ইসলাম গ্রহণের পর তাঁদের জীবন যাপন কতোটা দুঃসহ ছিলো, তা কথা সাহিত্যের নিটল বর্ণনায় বাঙময় হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

লেখক বদরুজ্জামানের এই প্রয়াস বেশ দুঃসাধ্য। কেননা, আমরা নানাসূত্র থেকে রাসূলের (সা.) প্রিয় সাহাবাদের জীবনী পড়ি ঠিকই কিন্তু তা কেবল জীবনী, তথ্য-উপাদানে আকীর্ণ। তাতে সাহিত্যের কারুকাজ শব্দ-বন্ধনের শিল্পিত রূপ নিতান্তই কম। বিদগ্ধ পাঠক তাই পাঠে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন না। তেমনি নিরাসক্ত পাঠকের জন্য এ বইটি সুখপাঠ্য হতে পারে– এ দাবী করা যেতে পারে। কেননা, তিনি এ বইটি জীবন চরিতের শিরোনামে জীবনের অন্তরঙ্গতার গভীরতর রূপটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদ পাবার দাবীদার। রাব্বুল আল-আমীন তাঁর লেখার হাতকে আরো সুদৃঢ় ও প্রসারিত করুন– এই কামনা করি। আমিন।

এস.এম.হারুন-উর-রশীদ
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ)
খান বাহাদুর আহছান উল্লা কলেজ
সখীপুর, সাতক্ষীরা।
০৩/১০/২০১০

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- ❑ হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) ॥ ১১
- ❑ হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) ॥ ১৬
- ❑ হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.) ॥ ২১
- ❑ হযরত আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা (রা.) ॥ ২৭
- ❑ হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.) ॥ ৩২
- ❑ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) ॥ ৩৬
- ❑ হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.) ॥ ৪২
- ❑ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ॥ ৪৬
- ❑ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াককাস (রা.) ৫০
- ❑ হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা.) ॥ ৫৩
- ❑ হযরত সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা.) ॥ ৫৬
- ❑ হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ (রা.) ॥ ৬০
- ❑ হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.) ॥ ৬৩
- ❑ হযরত আবুযর গিফারী (রা.) ॥ ৬৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)

ছ'শ' দশ খ্রিস্টাব্দ।

রমজান শেষ প্রান্ত ছুঁই ছুঁই করছে। কৃষ্ণপক্ষের রজনী। দিগন্ত জোড়া অন্ধকার। সারা আরব মরু ঘুমাচ্ছে, অচেতন সবকিছু : মানুষ, ঘর-গৃহস্থলি, পথ, পাহাড়, খেজুর গাছ, বালুময় প্রান্তর। ঘুমাচ্ছে মক্কা বাসিরাও, অঘোরে। নারী-পুরুষ, শিশু, কিশোর, অশীতিপর বৃদ্ধ– সবাই। কেবল চোখে ঘুম নেই আল-আমীন মুহাম্মদের (সা.)। অন্তরে তাঁর অন্তহীন ভাবনা। দুঃখের অতলান্তিকে নিমগ্ন তিনি। অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে ভরা এই আরব সমাজে তাঁর জন্ম। এই প্রতিবেশে কেটেছে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও চল্লিশ পূর্ব যৌবনের এক দীর্ঘ সময়। অশুভ আলোহীন অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে আলো দিতে কেউ এগিয়ে আসেনি। ঊষর মরুতে ঐশী আলোর বিচ্ছুরণ হয়নি বরং অবিশ্বাস, অজ্ঞতা, মিথ্যাচার, জুলুম আর রাহাজানিতে ভরে গেছে জীবন-পরিবার-সমাজ। লৌকিক ধর্মের কালো বৃত্ত থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারেনি। তিনি চান এই অন্ধকার-অশুভ জীবন থেকে মানুষকে আলোরপথে ফিরিয়ে আনতে।

এই ভাবনায় আচ্ছন্ন মন নিয়ে তিনি হাজির হলেন হেরা পর্বতের গুহায়। কাবাগৃহ থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে। নির্জন জনমানবহীন পর্বত– সেখানে মনের একান্তে একাকী বসবাস। দীর্ঘ ত্রিশ দিন। চেতন থেকে অবচেতন স্তরে পৌঁছে যান। গভীর ভাবময় অবস্থা। অশান্ত অবস্থা থেকে প্রশান্ত মানসলোকে এক আলো-আঁধারির খেলা।

প্রেমময়ী জীবন সঙ্গিনী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.) খেজুর ও রুটি দিয়ে যান কয়েক দিন পর পর। তাতে শরীরের ক্ষুধা মিটলেও হৃদয়ের ক্ষুধা মেটেনা। সহধর্মিণীর প্রেম, সোহাগ, সংরাগ, একান্ত সান্নিধ্য তাঁর যাপিত জীবনের প্রশান্তিকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছে। তবু এক অনাস্বাদিত ঐশী মিলনে ব্যাকুল তিনি। কী এক না পাওয়ার অস্থিরতা নিয়েই একান্ত

www.pathagar.com

ভাবনার গভীরে মিশে যান। অবচেতন– ঘুমন্ত– মগ্ন অবস্থার ভেতরেই তিনি শুনতে পেলেন এক আলোকময় সোচ্ছার আহ্বান :

– মুহাম্মদ

এ কার কণ্ঠ! অচেনা-অবাক করা আহ্বান! চমকে উঠলেন তিনি। সামনে তাঁর সচকিত দৃষ্টি। এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে। জিবরাঈল তাঁর নাম– মহাপ্রভুর বার্তাবাহক। যুগে যুগে তাঁর আগমন হয়েছে নবী ও রাসূলের সমীপে। এবারও তেমনি আগমন। হাতে তাঁর একখণ্ড রেশমী কাপড়। তাতে কিছু লেখা। যা মুহাম্মদ (সা.) কে দেখিয়ে বললেন ঃ

– পড়ুন।

– আমি পড়তে পারি না। ভয়াতুর কণ্ঠ মুহাম্মদের (সা.)।

জিবরাঈল তখন তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। নিজের বুকের সাথে চাপ দিলেন সজোরে। তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন ঃ

– পড়ুন।

– আমি পড়তে পারি না। আবারও জবাব দিলেন তিনি।

জিবরাঈল দ্বিতীয়বার তাঁকে বাহুপাশে আবদ্ধ করলেন। চাপ দিলেন আরো জোরে। সে চাপ সহ্যকরা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠলো তাঁর পক্ষে। জিবরাঈল আবারও আলিঙ্গন শিথিল করে বললেন ঃ

– পড়ুন।

– আমি পড়তে পারি না। একই জবাব।

জিবরাঈল তাঁকে তৃতীয়বার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। চাপ দিলেন ভীষণ জোরে। এতে একেবার শেষ হয়ে গেল তাঁর সহ্যশক্তি। কিছুক্ষণ পর ছেড়ে নিয়ে আবারও বললেন ঃ

– পড়ুন।

– কি পড়বো?

– পড়ুন আপনার সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন, আর আপনার প্রভু অতি সদাশয়।

www.pathagar.com

তিনিই কলম দিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সেই সব জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।

ভয়ে শিহরিত হলো মুহাম্মদের (সা.) নিবিষ্ট হৃদয়। কাঁপতে লাগলো তাঁর সারা শরীর। তিনি দ্রুত হেরার চূড়া থেকে নেমে এলেন নিচে। তারপর ব্যস্ত পায়ে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে।

ভোরের বেশি বাকি নেই। মৃদু হিমেল হাওয়া মরুর বুকে। রাতজাগা তারাগুলো এখনো মিট মিট করছে নীল আকাশে। পুণ্যভূমি মক্কার সমতলে দাঁড়িয়ে থাকা কাবার অস্পষ্ট ছবি চোখে পড়ে। এই পবিত্র গৃহের পাশেই মুহাম্মদ (সা.)– খাদিজা (রা.) দম্পতির গৃহ। যে গৃহে ঘুমাচ্ছেন খাদিজা। শিশুদের নিয়ে। পাশে জ্বলছে একটি প্রদীপ। অনুজ্জ্বল সে আলোর শিখা।

হঠাৎ শোনা গেল ব্যস্ত পায়ের শব্দ। তারপর দরজায় মৃদু আঘাত।

– কে? সভয়ে ও শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন খাদিজা।

– আমি আবুল কাসিম। শিগগির দরজা খোলো, খাদিজা।

মুহূর্তে উঠে বসলেন খাদিজা। দরজা খুলে দিলেন দ্রুত। প্রিয়তম স্বামীর অবস্থা ও বেশভূষা দেখে আঁতকে উঠলেন। একী অস্বাভাবিক ও মলিন চেহারা মুহাম্মদের। এলো মোলো চুল, শঙ্কিত দৃষ্টি, মুখের সেই কান্তিতে বিবর্ণরূপ।

– কি ব্যাপার, আবুল কাসিম? উদ্বেগভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন খাদিজা।

– খাদিজা! আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রাখো।

খাদিজা তাড়াতাড়ি তাঁর চোখে মুখে পানির ছিটা দিলেন। তারপর কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন সারা শরীর। কিছুক্ষণ কেটে গেলো। দূর হলো ভয়। সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন তিনি। তখন খাদিজার কাছে খুলে বললেন সব ঘটনা। তারপর বললেন ঃ

– আমার জীবনের আশঙ্কা হচ্ছে, খাদিজা।

– না, কখনো না। আপনার জীবনের কোনো ভয় নেই। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের হক আদায় করেন, অক্ষম

www.pathagar.com

লোকদের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেন, গরীব-দুখীদের সাহায্য করেন, পথিক-মুসাফিরদের মেহমানদারী করেন, বিপদে-মুসিবতে লোকদের সাহায্য করে থাকেন। অভয় দিলেন খাদিজা।

মুহাম্মদের (সা.) ভেতরের জগৎ নিয়ে উচ্চমানের ধারণা ছিলো খাদিজার। বিয়ের আগে থেকেই এ ধারণার উচ্চমূল্য তাঁকে বিমোহিত করে, বার বার। মুহাম্মদের চলাফেরা, কাজকর্ম, চিন্তা-ভাবনা সাধারণের মতো নয়, অসাধারণ, অনন্য। সত্য ও দিব্য জগতের আলোয় তিনি যে আলোকিত হবেন এ আভাস অনেক আগেই পেয়েছিলেন তিনি। তাই এ ঘটনাকে পরম শুভলক্ষণ বলে মনে করলেন। আনন্দিত হলেন মনে-প্রাণে।

রাত পোয়ালো। চারিদিকে ফুটে উঠলো সূর্যের আলো। খাদিজা স্বামীকে সাথে নিয়ে গেলেন তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের কাছে। শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ তিনি। বয়সের ভারে ন্যুব্জমান। পাণ্ডিত্যেও বিশাল মহীরুহ। তাওরাত ও ইঞ্জিল নিয়ে অনেক খেলাপড়া তাঁর। শেষ নবীর আগমন সম্বন্ধে সম্যক জানেন তিনি। খাদিজা স্বামীকে নিয়ে তাঁর পাশে বসলেন। তারপর বললেন ঃ

– ভাইজান! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।

– ভাতিজা, তুমি কি দেখেছো? উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন ওয়ারাকা।

মুহাম্মদ (সা.) তখন হেরা গুহার ঘটনা বর্ণনা করলেন সবিস্তরে। ওয়ারাকাও সব শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। জীবনের এ অন্তিম সময়ে ঐশী প্রতিজ্ঞার বাস্তবায়ন দেখে তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। তাঁর মুখে দেখা দিলো হাসির ঝলকানি আনন্দের আতিশয্যে তিনি বলে উঠলেন ঃ

– কুদ্দুসুন! কুদ্দুসুন! পবিত্র! পবিত্র! হযরত মূসা ও ঈসার কাছে আল্লাহ যে নামুসকে পাঠিয়ে ছিলেন, ইনি তো সেই নামুস। হায় মুহাম্মদ! তোমার দেশবাসী তোমার ওপর অত্যাচার করবে, তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে। আমি যদি সেই সময় বেঁচে থাকি, নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করব।

– আমার দেশবাসী আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মদ (সা.)।

– নিশ্চয়ই, হে মুহাম্মদ! তুমি যে সত্য নিয়ে এসেছো, যখনই কেউ এই

www.pathagar.com

সত্য নিয়ে এসেছেন, তখনই তাঁর স্বজাতি তাঁর সাথে শত্রুতা করেছে। তাঁকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। তাই তোমার স্বজাতিও যে তোমার সাথে শত্রুতা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ওয়ারাকা বিন নওফেলের শেষের কথায় মুহাম্মদ (সা.) – খাদিজা (রা.) দম্পতি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন, ভীত হলেন। তবু মনে তাঁদের এক নতুন সাফল্যের আনন্দ। আর এ আনন্দ নিয়েই ঘরে ফিরলেন তাঁরা।

– হে খাদিজা! আমার সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি? জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মদ (সা.)।

– আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আপনি এ যুগের মানব জাতির জন্য নবী হয়েছেন।

– তবে এক্ষুনি শিরক ও কুফরী থেকে তওবা করো। বিশ্বাস স্থাপন করো নিরাকার এক আল্লাহর ওপর।

– আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি তাঁর রাসূল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। নারীসুলভ দরদভরা কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন খাদিজা (রা.)।

নতুন ধর্ম ইসলাম। মহাসত্যের আলোকঝরা সংগ্রামী পথ। এ সংগ্রামী পথের প্রথম অনুসারী হলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। সংসার জীবনের জয়পরাজয় ও সন্ধির উৎস মূল্যে দাঁড়িয়ে বয়সে তরুণ মুহাম্মদকে (সা.) স্বাগত জানালেন এই নিষ্ঠাবতী নারী। দু'জনের প্রেম, প্রেরণা আর প্রণয়ের পাশে হৃদয়ে হৃদয়ে সঞ্চারিত হলো চির উদ্ভাসিত তৌহিদের আলোক প্রভা। শুরু হলো ইসলামের পথে হৃদয় সঙ্গিনীকে নিয়ে দুর্গম পথ চলা। সব বাধা ডিঙিয়ে এগিয়ে এলেন এই মহীয়সী নারী। ইসলাম গ্রহণের প্রথম সোপানে দাঁড়িয়ে স্বামীর সহযোগিনী হয়ে পভুর মনোনীত ধর্মকে প্রচারের কাজে এগিয়ে এলেন। ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হলো সেই মহিমান্বিত নাম ঃ হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)।

www.pathagar.com

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.)

ছ'শ' একষট্টি খ্রিস্টাব্দ।

মাহে রমজানের সতেরো তারিখ। শুক্রবার। সুবহে সাদিক। কুফা জামে মসজিদ থেকে ভেসে এলো সুরেলা আজান। প্রভুর স্মরণে সাড়া দিতে আকুল হলো খলিফা আলীর (রা.) প্রাণ। শয্যা ছেড়ে উঠলেন তিনি। ফজরের নামাজের জন্য রওনা হলেন মসজিদে। জামাতে ইমামতির মহান দায়িত্বও তাঁর।

পশ্চিম আকাশে তখনো কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথির চাঁদ। স্বচ্ছ-সুনির্মল সে জ্যোৎস্নার দ্যুতি। তাতে স্পষ্ট দেখা যায় সবকিছু। কুফার পথ, পথচারী, জনহীন প্রান্তর– সবকিছুই।

প্রতিদিনের মতো আজও 'সালাত' 'সালাত' বলে মুসুল্লীদের ডাকতে ডাকতে চলেছেন খলিফা। মসজিদের কাছাকাছি আসতেই সামনে এসে দাঁড়ালো দুই খারিজী দুশমন– শাবীব ইবনে বাজয়া ও আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম। হাতে তাদের শানিত তরবারি। মুখে তাদের ভয়ংকর রোষ। দাঁতে দাঁত চেপে একযোগে আক্রমণ করলো খলিফাকে। শাবীব ইবনে বাজয়ার তরবারি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলো; কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমের তলোয়ার লাগলো খলিফার মাথায়। মাথার শক্ত আবরণ ভেদ করে দাঁত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সাথে সাথে তিনি চিৎকার করে উঠলেন– 'আল্লাহর কসম! আমি সফল হয়েছি। আততায়ী যেন পালাতে না পারে।'

মুসুল্লীরা ছুটে এলো চারিদিক থেকে। শাবীব ইবনে বাজয়া পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো, কিন্তু আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিমকে ধরে ফেললো মুসুল্লীরা। তারা বন্দী করে রাখলো তাকে।

এদিকে আহত খলিফাকে বাড়ি আনা হলো তখনই। চলতে লাগলো সেবা-চিকিৎসা। তাঁর আঘাত ছিলো খুবই গুরুতর। তাই কিছুতেই উপশম হলো না। বরং আরো খারাপের দিকে যেতে লাগলো তাঁর অবস্থা।

www.pathagar.com

পার হলো এক এক করে তিন দিন তিন রাত। একুশে রমজান রাতে কলেমা পড়তে পড়তে শাহাদাত বরণ করলেন ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)। এই কলেমার বাণীই তিনি উচ্চারণ করেছিলেন মাত্র দশ বছর বয়সে। হযরত খাদিজার (রা.) পরে হযরত আলী (রা.) ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বাসী, মুসলিম। রাসূলের (সা.) হাত ধরে অন্তরের সত্যে ধারণ করেন প্রভুর অস্তিত্বের বিশ্বাস। বালক বয়সে ঈমানের এই দৃঢ়তা ও জোস উত্তরকালে ইসলামের বিজয় ও প্রসারে দ্যুতি ছড়ায়। শরীর আর মননের সমন্বয়ে গড়া এমনি অমিত শক্তির মানুষ ইসলামের ইতিহাসে নিতান্তই বিরল। 'শেরে খোদা' উপাধি তো তিনি জীবদ্দশাতেই পেয়েছিলেন।

তাঁর ছেলেবেলায় শুরুটা ছিলো আরো অলৌকিক, পুণ্যময়, পয়মন্ত। কাবা তপরত অবস্থায় মায়ের প্রসব বেদনা ওঠে। ব্যথায় মুষড়ে পড়েন ফাতিমা। তাঁর অর্ধচৈতন্য অবস্থা। ভূমিষ্ঠ হন নবজাতক আলী (রা.)। যেনো হৃদয় আর শরীরের আলো ছড়াতেই আলীর (রা.) এ পুণ্য গৃহের আঙ্গিনায় জন্ম।

জন্মের পরে কাটলো আরো পাঁচ পাঁচটা বছর। নবী পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হবার সুযোগ এলো তাঁর।

মহানবী মুহাম্মদের (সা.) বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। জীবনসঙ্গিনী খাদিজাতুল কুবরাকে (রা.) নিয়ে সচ্ছল জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। ধনবতী পত্নীর তরফ থেকে পাওয়া অঢেল ধন-সম্পদ দু'হাতে দান করছেন। দীন-দরিদ্রদের মাঝে। এমনি সময় মক্কায় এলো ভীষণ এক দুর্ভিক্ষ। তীব্র খাদ্য সংকটে পড়লো সবাই। অবস্থাপন্ন কুরাইশরাও।

কুরাইশদের মধ্যে আবু তালিব অসচ্ছল ও অধিক সন্তানের জনক। চার পুত্র ও দুই কন্যার পিতা তিনি। খুব বড় সংসার তাঁর। কিন্তু রোজগারী মানুষ তিনি শুধু একা। তাঁকেই যোগাতে হয় একটি বিশাল পরিবারের ভরণ-পোষণ। তার ওপর এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দারুণ দুর্দশায় পড়লেন তিনি। পরিবার প্রতিপালন করা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠলো তাঁর পক্ষে।

আবু তালিবের এই দুরবস্থা দেখে কেঁদে উঠলো ভাতিজা মুহাম্মদের দয়ার্দ্র হৃদয়। তিনি চলে গেলেন তাঁর আরেক সচ্ছল চাচা আব্বাসের কাছে। কোমল কণ্ঠে বললেন ঃ

www.pathagar.com

– চাচাজান, আপনার ভাই আবু তালিবের পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী। তাইতো তিনি বেশ দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছেন।

– তাতো ঠিকই। কিন্তু আমরা এখন কি করতে পারি?

– চলুন, আমরা তাঁর সন্তানভার লাঘব করি। তাঁর পুত্রদের মধ্য হতে একজনের দায়-দায়িত্ব আমি নিই আর আপনি নিন আরেক জনের দায়িত্ব। এভাবে দু'টি সন্তানের ব্যয়-ভার থেকে রেহাই পাবেন তিনি।

– ঠিক আছে, চলো যাই। রাজি হলেন আব্বাস।

আবু তালিবের চার পুত্র– তালিব, আকিল, জাফর ও আলী। জাফরকে আব্বাস আর আলীকে নিলেন মুহাম্মদ (সা.)। আলী তখন পাঁচ বছরের শিশু। অটুট তাঁর স্বাস্থ্য, সিগ্ধ কোমল কান্তি, কালো চোখে তাঁর স্থির উন্নত দৃষ্টি। স্বভাবে শান্ত, আর দশটা শিশুর মতো উচ্ছল ও ডানপিটে নয়। ধীর ও প্রশান্ত। যে কাউকে মুগ্ধ করার মতো।

এর আগে মুহাম্মদ (সা.) হারিয়েছেন দুই শিশু পুত্রকে (কাসিম ও আব্দুল্লাহ)। যাঁদের অভাবের আসন অনেকটা পূর্ণ করেন যায়েদ। এরপর আলী। তাঁকে সস্নেহে প্রতিপালন করতে লাগলেন তিনি। খাদিজার হৃদয়ে পুত্র স্নেহের জোয়ার এলো। মাতৃত্বের আবেগভরা আকৃতি এক অনাবিল প্রাপ্তিতে পূর্ণ হলো। মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ ও মমতার বন্ধন আলীকে বড় করে তুলতে লাগলো, ধীরে ধীরে।

অন্যদিকে আলী পেলেন আলোকিত মহামানব মুহাম্মদের (সা.) নিবিড় সান্নিধ্য। যে পরশ পাথরের ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়, সেই ছোঁয়া পেলেন শিশু আলী। সব সময় মুহাম্মদের (সা.) কাছে থাকেন তিনি। মুহাম্মদও পরম যত্ন– সোহাগে কাছে রাখেন তাঁকে। তিনি তাঁকে আদর করে কোলে তুলে নেন, চুমো খান, শোয়ান নিজের বিছানায়। তাঁর সুবাসিত দেহের স্পর্শ লাগে আলীর শরীরে। আলী সব সময় অনুসরণ-অনুকরণ করেন মুহাম্মদকে (সা.)। তাঁর মার্জিত আচরণ থেকে প্রতিদিন এক একটি বিষয় শেখেন আর তা মেনে চলেন। সরাসরি, কখনো নীরবে-নিভৃতে-সংগোপনে। এভাবে মুহাম্মদের অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন

www.pathagar.com

ঘটলো আলীর শিশু হৃদয়ে। আরব সমাজের কদর্য পাপের অনিবার্য স্পর্শ থেকেও তিনি রইলেন অনেক দূরে। কৈশোর পার না হতেই পেলেন এক অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা। যার আবরণ ছিল শক্ত। সততা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, উদারতা, ন্যায়নিষ্ঠা– এসব দুর্লভ গুণপনায় তাঁর ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলো উজ্জ্বল, দ্যুতিময়।

পর হলো আরো পাঁচটি বছর। এলো ছ'শ' দশ খ্রিস্টাব্দ। দশ বছরে পা রাখলেন আলী। আর তখনই চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়তের অতিন্দ্রীয় আলো পেলেন মুহাম্মদ (সা.)। হেরা গুহায় অভিষেকের পরই তিনি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের প্রচার শুরু করলেন। সংগোপনে। তাঁর খুব কাছের মানুষদের মধ্যে। তাঁর আহ্বানে সবার আগে সাড়া দিলেন তাঁর জীবন–সঙ্গিনী হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা.)। ইসলাম গ্রহণ করলেন তিনি। ইসলামের আচার-আচরণ পালনের বিধান তখনো প্রসার লাভ করেনি। তবু নিষ্ঠাবতী স্ত্রীকে নিয়ে নামাজ পড়তেন তিনি। একদিন তারা দু'জন নামাজ পড়ছিলেন ঘরে। আচমকা আলী ঢুকে পড়লেন সে ঘরে। কিশোর আলীর কাছে এ দৃশ্য অভাবিত মনে হলো। ভাবলেন, এভাবে কেউ উপাসনা তো করে না। আরবের কেউ না– একটি মানুষও না। হতচকিয়ে গেলেন এ বালক। তাঁদের নামাজ পড়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করে বসলেন ঃ

– কি করছিলেন আপনারা?

– আমরা আল্লাহর মনোনীত দীনের বিধান পালন করি। তাই নামাজ পড়ছিলোম। বললেন নবী (সা.)।

– কিন্তু এমন ধর্মের কথা তো আমি আগে কখনো শুনিনি।

– এতো নতুন কিছু নয়। এতো আমাদের পিতা হযরত ইব্রাহীমের (আ.) ধর্ম। আলী! তুমিও এই ধর্ম গ্রহণ করে নাও।

– পিতাকে না জানিয়ে আমি এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

– আলী! আল্লাহর পাঠানো এ ধর্ম এখন সরাসরি আলোচনা করা যাবে না। তুমি যদি গ্রহণ না করো, তবে বিষয়টা গোপন রাখো।

– আচ্ছা, তাই হবে।

www.pathagar.com

তখনকার মতো চলে এলেন আলী। রাতে ভাবতে লাগলেন নির্জনে। ভাবলোকের নিঝুম প্রকোষ্ঠে।

– মুহাম্মদ (সা.) আমার আপন চাচাতো ভাই। জন্ম থেকে দেখছি তাঁকে। সৎ, সত্যবাদী ও আমানতদার মানুষ তিনি। জীবনে কোনো দিন মিথ্যা কথা বলেননি। কারো আমানতের খেয়ানত করেননি। এজন্য মক্কার সবাই তাঁকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, 'আল-আমীন' বলে ডাকে। সেই আল-আমীনই বলছেন– আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ইসলামই তাঁর পাঠানো একমাত্র জীবন বিধান। আলী! এই ধর্ম গ্রহণ করে নাও। অতএব মুহাম্মদের (সা.) কথাই সত্য। ইসলামই সঠিক ধর্ম।

বিশ্বাসের আলোর ছটা এসে পড়লো আলীর বুকে, নিবিষ্ট চেতনায়। অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। ইসলামের শীতল ছায়া তলে আসার জন্য। ভোর না হতেই নবীর সমানে হাজির হলেন। বললেন ঃ

– গতকাল আপনি আমাকে যা বলেছিলেন, আজ আবার একটু বলুন।

– তুমি সাক্ষ্যি দাও আল্লাহ ছাড়া আর কোনো এলাহ নেই। আর অস্বীকার করো লাত-উজ্জাকে। আলী আর এক মুহূর্তও দেরী করলেন না। পিতার সাথে পরামর্শের প্রয়োজনও হলো না। সেই মুহূর্তে কচি কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

তাওহীদের চিরায়ত আলোর পথে এলেন কিশোর আলী। ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণোজ্জ্বল হয়ে রইলো একটি নাম ঃ কিশোর সাহাবী হযরত আলী (রা.)।

www.pathagar.com

হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রা.)

চলেছে কাফেলা। সিরিয়া সীমান্তের দুর্গম মরুপথ। সন্ধ্যা আগত। আলো-আঁধারিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে ধরাতল। যাত্রীরা শ্রান্ত, অবসন্ন। এখানেই রাত কাটাতে হবে। তাঁবু বানানোর আদেশ এলো দলের সর্দারের কাছ থেকে।

সন্ধ্যা পার হয়ে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লো। এলো গভীর রাত। ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে গোটা কাফেলা। সবাই অচেতন। নিজ তাঁবুতে আট বছরের শিশু পুত্র যায়েদকে নিয়ে ঘুমাচ্ছেন সুদা বিনতে সালাবা। উত্তর আরবের দুমাতুল জান্দাল জনপদে বাস তাঁর। সেখানকার কালাব গোত্রের সর্দার হারিসা বিন শারাহিলের সহধর্মিণী তিনি। পুত্রকে নিয়ে যাচ্ছেন পিতৃ গোত্রে।

হঠাৎ হৈ চৈ। শোরগোল। ঘুম ভেঙে গেলো সুদার। ওঠে বসলেন তিনি। ঘুম জড়ানো চোখে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন। দেখেই শিউরে উঠলেন। আঁতকে উঠলো শরীর-মন ঃ

– সর্বনাশ! এ যে লুটেরার দল। লুট করছে কাফেলা। ছিনিয়ে নিচ্ছে সবকিছু। ওই তো এদিকেই আসছে ওরা। হায়! হায়! এখন আমি কী করবো!

ভীত-সন্ত্রস্ত সুদা যায়েদকে গভীর মমতায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এভাবে পুত্রকে আগলে রাখবেন তিনি। লুটেরাদের হাতে দেবেন না। কিছুতেই না।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দেখতে না দেখতে সুদার তাঁবুও আক্রান্ত হলো। মাল-সামানের সাথে ওরা মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিলো শিশু পুত্র যায়েদকে।

লুটেরারা উটের পিঠে তুললো যায়েদকে। তারপর নিয়ে চললো তাঁকে। দিগন্ত জোড়া মরুভূমির হারিয়ে যাওয়া সীমানায়।

এ অভাবিত, অনাকাঙ্ক্ষিত দৃশ্য দেখতে হয়নি পুত্রহারা সুদার। তার আগেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন তিনি। যখন চেতনা ফিরে এলা, চোখের পাতা মেলে

www.pathagar.com

দেখলেন ঃ শিশু যায়েদকে নিয়ে ওরা পালিয়েছে ঃ কোথায়, কোন্ অজানা ঠিকানায় তা প্রভু ছাড়া কেউ জানে না।

পুত্রকে না পেয়ে ঢুকরে কাঁদতে লাগলেন মমতাময়ী সুদা। তাঁর কান্না ও কাতর রোদনে যেন বেদনাহত হয়েছিল মরুর পশু, পাখ-পাখালি, দুরন্ত লু-হাওয়া আর দাঁড়িয়ে থাকা খেজুর গাছের সারি।

এ দুঃখজনক ঘটনার ক'দিন পেরিয়ে গেছে। মক্কার হাকীম ইবনে হিযাম ইবনে খুয়াইলিদ উকাজ মেলে থেকে বাড়ি এসেছেন। খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে এলেন খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ। তাঁর আপন ফুফু। মক্কার সবচে' ধনবতী রমণী। তাঁকে দেখেই হাকিম বললেন ঃ

– ফুফু আমি উকাজ থেকে কয়েকটি দাস কিনে এনেছি। আপনাকে একটি দিতে চাই। বলুন, কোন্‌টি নেবেন।

হাকিমের কথা শুনে খাদিজা দাসগুলো দেখতে লাগলেন। বিচক্ষণ দৃষ্টি তাঁর। দেখলেন দীর্ঘ সময় ধরে। একটি ছেলেকে খুব ভালো লাগলো তাঁর। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সততার ছাপ ছেলেটির চেহারায়। তাঁর দিকে ইঙ্গিত করেই বললেন ঃ

– এই ছেলেটিকে চাই আমি।

– তাই–? ওর নাম যায়েদ। যায়েদ বিন হারিসা। ওকে চারশ' দিরহাম দিয়ে কিনেছি। ঠিক আছে, ওকেই নিন আপনি।

যায়েদকেই বেছে নিলেন তিনি। বাড়ির ছোট-খাট কাজে লাগালেন তাঁকে। খাদিজার বৈধব্য বেশ। আগের ঘরের কয়েকজন পুত্র ছিলো তাঁর। তাঁদের কেউ কেউ মারাও গেছে। তিনি সেই পুত্রদের ছায়া দেখতে পেলেন যায়েদের ভেতরে। সন্তানের প্রতিচ্ছবি বিধবা মাতাকে কাতর করে তোলে। যায়েদের ভেতর-বাইরে নিজের সন্তানের ছায়া দেখলেন। আপন মাতৃ হৃদয়ের মুকুরে যায়েদের স্নেহ প্রতিম ছবি ভেসে উঠলো। এই হৃদয় সত্যের পরশে দিন দিন খাদিজার অপার সান্নিধ্যে বড় হতে লাগলেন যায়েদ।

ওদিকে পুত্র শোকে কাতর যায়েদের পিতা-মাতা। ঘুম নেই তাঁদের চোখে।

www.pathagar.com

হারিসা প্রাণ প্রিয় পুত্রকে খুঁজে বেড়ান সবখানে। গ্রাম, গঞ্জ, লোকালয়, মরুপ্রান্তর–সবখানে। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড়– সবার কাছে জিজ্ঞেস করেন পুত্রের কথা। কিন্তু কেউ বলতে পারে না তাঁকে। তখন রোদন করেন তিনি। আবৃত্তি করেন স্বরচিত কবিতা। যা শুনে পানি আসে শত্রু-মিত্র সবার চোখে ঃ

– আমি বিচরণকারী উটের মতো পুত্র যায়েদের সন্ধানে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াব। আমার উট ক্লান্ত হতে পারে; কিন্তু পুত্র সন্ধানে সারা পৃথিবী ঘুরতে আমি কখনো শ্রান্ত হবো না।

আমি বাঁচি আর মরি পুত্র যায়েদকে খুঁজে বের করবই, প্রাণী মাত্রই মরণশীল যদিও আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে ধোকায় লিপ্ত রাখে। আমি কাইস এবং উমরের প্রতি যায়েদকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেবো; নির্দেশ দেবো ইয়াযিদকে, আর আমি নির্দেশ দেবো জবলা ইবনে হারিসাকে।

সময় পার হলো। এক এক করে পেরিয়ে গেলো সাতটি বছর। পনেরো বছরে পৌঁছে গেলেন যায়েদ। আর তখনই চল্লিশ বছরের বিধবা খাদিজাতুল কুবরার সাথে বিয়ে হলো পঁচিশ বছরের যুবক মুহাম্মদের (সা.)। বিয়ের পর পতিপ্রাণা পত্নী খাদিজা স্বামীকে একটি উপহার দিতে চাইলেন। যা হবে সবচে' সুন্দর ও শোভাকর। কিন্তু কি দেবেন তিনি? অনেক ভাবলেন খাদিজা। পুত্র প্রতিম যায়েদ অপেক্ষা উত্তম কিছু পেলেন না আর। তাই তাঁকেই দিলেন স্বামীর খেদমতে।

যায়েদের সুন্দর চরিত্র, সীমাহীন নিষ্ঠা, প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা মুগ্ধ করলো মুহাম্মদকে (সা.)। তিনি দাসত্ব থেকে মুক্তি দিলেন তাঁকে। গ্রহণ করলেন নিজ পুত্ররূপে। দিনে দিনে যায়েদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতা এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, তাঁকে ছাড়া তিনি থাকতেই পারেন না। যায়েদও পারেন না মনিব মুহাম্মদকে (সা.) ছেড়ে থাকতে।

মুহাম্মদের (সা.) অপত্য স্নেহের ছায়ায় দিন কাটতে লাগলো যায়েদের । একবার হজ্জের সময় এলো। হজ্জ করতে কালাব গোত্রের কয়েকজন লোক মক্কায় এসেছে। কাবা তওয়াফ করার সময় তারা মুখোমুখি হলো যায়েদের।

www.pathagar.com

তারা চিনতে পারলো যায়েদকে। যায়েদও চিনে ফেললেন তাদের। কুশল বিনিময় হলো পরস্পরের।

হজ্জ শেষ হলো। লোকগুলো ফিরে গেলো নিজ গোত্রে। হারিসাকে জানালো যায়েদের খবর। হারানো ছেলের সন্ধান পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন হারিসা। সেই মুহূর্তে ভাই ক'াবকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হলেন মক্কায়।

দুমাতুল জান্দাল থেকে মক্কা অনেক দূরের পথ। বিরামহীন পথ চলতে লাগলেন তারা। চলতে চলতে পৌঁছে গেলেন এক সময়। তারপর হাজির হলেন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহর কাছে। বিনয়ের সাথে বললেন ঃ

– হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর! আপনারা আল্লাহর ঘরের প্রতিবেশী। অসহায়ের সাহায্যকারী, ক্ষুধার্তকে অন্নদানকারী, আশ্রয় প্রার্থীকে আশ্রয় দানকারী। আপনার কাছে আমাদের যে ছেলেটি আছে, তার ব্যাপারে এসেছি আমরা। মুক্তিপণও সংগে নিয়ে এসেছি। আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনার ইচ্ছামত মুক্তিপণ ধার্য করুন।

– আপনারা কোন্ ছেলের কথা বলছেন? জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মদ (সা.)।

– আপনার দাস যায়েদ ইবনে হারিসা।

– আপনারা কি চান, আমি মুক্তিপণের চেয়ে ভাল কিছুর ব্যবস্থা করি?

– সেটা কি?

– আমি তাকে আপনাদের সামনে ডাকছি। সে স্বেচ্ছায় নির্ধারণ করুক, আমার সাথে থাকবে, না আপনাদের সাথে যাবে। যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, মুক্তিপণ ছাড়াই তাকে নিয়ে যাবেন। আর আমার সাথে থাকতে চাইলে আমার কিছু করার নেই।

– আপনি বড় ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন। খুশী হয়ে বললো তারা।

ডাকা হলো যায়েদকে। তিনি এসেই দাঁড়িয়ে রইলেন নির্বাক। নির্বাক সেখানে উপস্থিত সবাই। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

– যায়েদ, এরা কারা তা জানো? জিজ্ঞেস করলেন মুহাম্মদ (সা.)।

– জানি। ইনি আমার পিতা আর উনি আমার চাচা কা'ব।

www.pathagar.com

– যাও। তাদের কুশল সংবাদ নাও।

এগিয়ে গেলেন যায়েদ। মিলিত হলেন পিতা ও চাচার সাথে। হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন হারিসা। পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন তিনি। চোখের পানিতে দাড়ি-কাপড় ভিজে গেল তাঁর। পিতা-পুত্রের মিলনের এ দৃশ্য দেখে উপস্থিত লোকদের চোখেও এলো আনন্দ অশ্রু। কেঁদে ফেললো তারাও।

কিছুক্ষণ কেটে গেলো। আবেগ কিছুটা শিথিল হলো। তখন মুহাম্মদ (সা.) বললেন ঃ

– যায়েদ, তোমার পিতা ও চাচা তোমাকে নিতে এসেছেন। আমি তোমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। তুমি যদি তাদের সঙ্গে যেতে চাও, এখনি যেতে পারো।

– হে আমার মনিব! আপনার চেয়ে আর কাউকে আমি বড় করে দেখতে পারিনে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে আপনার কদম মোবারক থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। মিনতি স্বরে বললেন যায়েদ।

যায়েদের কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন হারিসা। নিজের কানকেও তিনি যেনো বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভুল শোনেননি তো? না, তিনি তো স্পষ্ট শুনলেন ছেলের কথা।

– যায়েদ, তোমার সর্বনাশ হোক। আপন পিতা-মাতাকে ছেড়ে তুমি গোলামীর জীবন বেছে নিচ্ছো? বললেন হারিসা।

– এই মানুষটির মধ্যে আমি এমন কিছু দেখেছি, যাতে আমি তাঁকে কখনো ছেড়ে যেতে পারবো না। বললেন যায়েদ।

যায়েদের সিদ্ধান্ত শুনলেন মুহাম্মদ (সা.)। খুব খুশী হলেন তিনি। যায়েদের কাছে গেলেন তিনি। তাঁর হাত ধরলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে চললেন কাবার দিকে। হারিসা ও সমবেত লোকেরাও চললো তাঁদের পিছে পিছে। বিরাট কৌতূহল তাদের মনে। মুহাম্মদ কী করেন তা দেখতে চায় তারা।

হাজরে আসওয়াদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মুহাম্মদ (সা.)। তারপর সমবেত কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ

www.pathagar.com

– হে কুরাইশরা! তোমরা সাক্ষী থাকো। আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে। সে আমার উত্তরাধিকারী আর আমি তাঁর উত্তরাধিকারী।

মুহাম্মদের (সা.) এ ঘোষণায় ভীষণ আনন্দিত হলেন হারিসা। আনন্দেয় কেঁদে ফেললেন তিনি। তাঁর মনে আর কোনো দুঃখ রইলো না। যায়েদ একজন মহাপ্রাণ মানুষের কাছে আছে। ভাবলেন তিনি। তাই খুশী মনে ফিরে গেলেন বাড়ি।

তারপর কেটে গেলো আরো কয়েকটি বছর। মুহাম্মদের (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তি হলো। চল্লিশ বছর বয়সে। সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করলেন তাঁর সহধর্মিণী খাদিজাতুর কুবরা (রা.) ও চাচাতো ভাই আলী (রা.)। তাঁদের সাথে যায়েদেরও এই জ্যোতির্ময় আলোয় আলোকিত হতে মন চাইলো। কেননা এ আলোর আহবানকারী তো তাঁর স্মৃতিতে চিরভাস্বর, বাস্তব ছায়ার মতো। তিনি কোনো দিন মিথ্যা বলেন নি। কোনো দিন যায়েদকে কোনো কাজের জন্য ধিককার দেননি, তিরস্কার করেন নি। স্নেহের-মায়ার বন্ধনে বেধে ফেলেছেন তাঁকে। তাঁর হৃদয়ের আলো যায়েদের হৃদয়ে জ্বেলে দিতে চান। ইসলামের আলোয় দীপিত করতে চান ক্রীতদাসের আপন সত্তাকে। তাই মহানবী (সা.) যে আহ্বান জানালেন যায়েদকে, তাতে তিনি সাড়া দিলেন। জীবন তাঁর সফল হলো। দিনে দিনে এলো আরো প্রাপ্তি, আরো সাফল্য। ক্রীতদাস যায়েদ একদিন মুতা যুদ্ধের সেনাপতির পদ পেলেন। শহীদের অমিয় সুধা পান করলেন। মহামানবের স্বর্ণালী সান্নিধ্যে ইতি–হাসের বরণীয় পুরুষের স্মৃতিতে পা রাখলেন।

www.pathagar.com

– আমার কাছে বায়তুল মালের আর কি আছে?

– একটি বাঁদী ও দু'টি উট।

– এগুলো এবং আরো যদি অবশিষ্ট কিছু থাকে তাও আমার মৃত্যুর পর উমরের (রা.) কাছে পাঠিয়ে দিও।

– আচ্ছা। পিতার কথায় সায় দিলেন হযরত আয়েশা (রা.)।

– এরপর গায়ের পোশাক খুলে ধুয়ে নিও। আর তা দিয়েই আমার কাফন দিও।

– এতো পুরানো কাপড়। বেশ অবাক হলেন আয়েশা (রা.)।

– মৃতের চেয়ে জীবতের নতুন কাপড় বেশী জরুরী। আমার লাশের জন্য এই যথেষ্ট।

রোগ শয্যায় কাতর হলেন আবু বকর (রা.)। অপেক্ষা করতে লাগলেন চিরবিদায়ের অন্তিমলগ্নের জন্য। আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– আজ কি বার?

– সোমবার।

– রাসূলের (সা.) কোন্ বারে বেসাল হয়েছিল?

– সোমবারে।

– আমি আশা রাখি আজ সন্ধ্যার মধ্যে এ জগৎ সংসার ত্যাগ করবো।

আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন। সোমবার দিবাগত মঙ্গলবারের শুরুতে তাঁর মৃত্যু হয়। নতুন ধর্ম ইসলাম প্রথম কবুলকারী বয়স্ক পুরুষ, রাসূলের (সা.) সওর গুহার একান্ত সাথী ও আমরণ ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গকারী মানুষটির জীবন অবসান হলো। জানাযা পড়ালেন হযরত উমর (রা.)। ওসমান (রা.) ও তালহা (রা.) তাঁর দেহ কবরে রাখেন। প্রিয়তম রাসূলের (সা.) পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। এ জানাযায় শরীক হন

www.pathagar.com

তাঁর সাতানব্বই বছর বয়সের পিতা আবু কুহাফা (রা.)। পিতার হাতে পুত্রের এ দাফন বড়ই মর্মান্তিক, করুণ ও বিষাদঘন।

জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনাধীন এ মাটির পৃথিবীতে আবু বকরের (রা.) আগমন ঘটেছিল ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের তাঈম গোত্রে। আর মহানবী মুহাম্মদ (সা.) জন্মেছিলেন ৫৭১ খ্রিস্টাব্দে। কুরাইশ বংশের হাশিম গোত্রে। তাই একই বংশজ এবং প্রায় সমবয়সী ছিলেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, জন্ম থেকে প্রায় একই রকম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও পেয়েছিলেন দু'জন। দু'জনের আচার-আচরণ, চলাফেরা, কথাবার্তা, মন- মানসিকতা– সব কিছুরই মধ্যে ছিলো বিরাট মিল। দু'জনই ছিলেন সৎ, সত্যবাদী, দয়ালু ও পরোপকারী। দু'জনই মূর্তি পূজা ও মদ্যপানকে ঘৃণা করতেন মনে-প্রাণে।

এমনি সব সাদৃশ্যের কারণে বাল্য থেকে দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে গভীর বন্ধুত্ব, সখ্যতা। বন্ধু চায় সব সময় বন্ধুর সান্নিধ্য। এ দুই বন্ধুর চাওয়াও ছিলো তাই। আবু বকর (রা.) সব সময় কামনা করতেন মুহাম্মদের (সা.) সোহবত আর মুহাম্মদ কামনা করতেন করতেন আবু বকরের সাহচার্য। আবু বকর (রা.) ছাড়া আর কারো সাথে মনের মিল হতো না মুহাম্মদের (সা.)। তাই তো নবুয়তের আগেও প্রায় প্রতিদিন আবু বকরের (রা.) বাড়িতে যেতেন তিনি। তাঁর সাথে দেখা করতেন, কথা বলতেন। মতামত ও ভাব বিনিময় হতো দু'জনের। আরো গভীর হয়ে ওঠতো তাঁদের বন্ধুত্ব।

ইসলামের আবির্ভাবের আগে মক্কার কুরাইশদের জীবিকা অর্জনের মূল উৎস ছিলো ব্যবসা। তাঁরা ব্যবসা করতেন প্রায় সবাই। এ মহৎ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন আবু বকরও (রা.)। সেই সুবাদে অনেক সময় মক্কার বাইরে থাকতেন তিনি। বাণিজ্য-সম্ভার নিয়ে যেতেন ইয়েমেন, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে দেশে। নবুয়তের আগে প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদের (সা.) সাথেও বাণিজ্যিক সফর করেছেন সিরিয়ায়। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন সেখানকার আলোর পথহারা মানুষকে। তাদের অজ্ঞতা, অনাচার, বিশ্ব বিধাতার প্রতি অবিশ্বাস ও অনৈতিক বন্ধনহীন পাপময় জীবন যাপনকে। আর তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে নিভৃতচারী জ্যোতির্ময় পুরুষ মুহাম্মদকে (সা.)। যিনি তাঁর আবাল্য সঙ্গী, সহযোগী, সহকর্মী– এতো সাধারণ মুখের ভিড়ে এক

www.pathagar.com

অসাধারণ হাস্যোজ্জ্বল মুখ। মরু-আরবের ঊষর ভূমিতে এমনি মুখের তুলনা মেলে না। তিনি অনন্য, অপ্রতিম। তাই যখনই আবু বকর (রা.) তাঁর সান্নিধ্যে যেতেন, তখনই তাঁর তৃষিত হৃদয় ভরে উঠতো বিস্ময়ভরা মুগ্ধতায়।

বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশে বহুদিন কাটাতেন আবু বকর (রা.)। পণ্য সামগ্রী বেচা-কেনা করতেন। তারপর ফিরে আসতেন আপন গৃহে, মক্কায়। মহানবীর (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির সময় বাণিজ্য উপলক্ষে ইয়েমেনে ছিলেন তিনি। সেখান থেকে ফিরে এলেন বেশ কিছুদিন পর। খবর পেয়ে আবু জাহেল, আবু সুফিয়ান, ওতবা, শাইবারা এলো তাঁর কাছে। নবুয়তের অভাবিত, অতিলৌকিক খবরটি পরিবেশনের জন্য।

– আপনারা কেমন? জিজ্ঞেস করলেন আবু বকর (রা.)।

– ভালো। আপনি? জিজ্ঞেস করলো ওরাও।

– ভালোই। দেশের খবর কি? জানতে চাইলেন আবু বকর।

– দেশের খবর ভালো; তাবে একটা মজার খবর আছে। আবু জাহেল বললো।

– কি খবর? উৎসুক প্রশ্ন আবু বকরের।

– আব্দুল্লাহর এতিম ছেলে মুহাম্মদ নবুয়তের দাবী করেছে। বললো আবু জাহেল।

আবু জাহেলের কথা শেষ না হতেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো তার সঙ্গীরা। কিন্তু আশ্চর্য! আবুবকরের মুখে কোনো হাসি নেই, কথা নেই। নির্বাক তিনি। আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছেন। খানিক পরে হঠাৎ আসন ছেড়ে উঠলেন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর চললেন মুহাম্মদের (সা.) বাড়ির দিকে।

– এবার ওষুধ ধরেছে। আবুবকর মুহাম্মদের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সেই বন্ধুই আজ ক্ষেপে গেছে। মুহাম্মদ এবার বুঝবে নবুয়ত লাভের মজা। বলতে লাগলো আবু জাহেল ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

আবু বকর (রা.) সোজাসুজি মুহাম্মদের (সা.) কাছেই এলেন। কুশল খবর নিলেন। তারপর বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

www.pathagar.com

– আপনি কি নতুন কোনো ধর্ম প্রচার করছেন? আমরা যে ধর্ম দীর্ঘকাল পালন করে আসছি, তা কি মিথ্যে?

– আপনি যা শুনেছেন সবই সত্য। নিজ হাতে গড়া মাটির পুতুলের কোনো ক্ষমতা নেই। সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, (আমি) মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। ধীর-শান্ত কণ্ঠে বললেন মুহাম্মদ।

আর কোন প্রশ্ন করলেন না আবু বকর (রা.)। কি প্রশ্ন করবেন তিনি? কেন করবেন? প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদকে (সা.) তো জীবনে কখনো মিথ্যা বলতে শোনেননি। তাঁর কথার সাথে কাজের অমিলও দেখেননি কোনো দিন। তাঁর অসাধারণ চারিত্রিক শোভা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, বার বার। তিনি যে নবুয়তের আলোয় আলোকিত হবেন এমনি আভাষ অনেক আগেই পেয়েছিলেন আবু বকর (রা.)। আর সেই থেকে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। সত্য গ্রহণের জন্য উদগ্রীব ছিলো তাঁর তৃষিত হৃদয়।

সে অনেক দিন আগের কথা। আবু বকর তখন সতেরো আঠারো বছরের যুবক। আর মুহাম্মদের বয়স প্রায় বিশ। মুহাম্মদের সাথে ব্যবসা করতে যাচ্ছেন সিরিয়ায়। সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে বিশ্রাম নিচ্ছেলেন তাঁরা। মুহাম্মদ (সা.) বসেছিলেন একটি গাছের ছায়ায়। আর আবু বকর (রা.) ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এদিক ওদিক। হঠাৎ তাঁর সাথে দেখা হলো এক খৃস্টান পাদ্রীর। নাম তাঁর নাসতুরা। তিনি আন্তরিক ভাবে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন তাঁর সাথে। এক পর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– ওই গাছের নীচে কে?

– এক কুরাইশ যুবক, নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ।

– এই যুবকই আরবদের নবী হবেন। বলে উঠলেন পাদ্রী নাসতুরা।

পাদ্রীর কথাটা বিশ্বাস হলো আবু বকরের (রা.)। আর তিনি তা গেঁথে রাখলেন অন্তরে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকেন দিনের পর দিন। এই ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবায়ন দেখার জন্য। আজ মুহাম্মদরে স্বকণ্ঠের ষোঘণায় সে অপেক্ষার অবসান হলো। বিশ্বাসের অনাবিল আলোয় দীপিত হলো

www.pathagar.com

তাঁর সত্যান্বেষী অন্তরদেশ। আর এক মুহূর্তেও দেরী করলেন না তিনি। মুহাম্মদের (সা.) একেবারে কাছে চলে এলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে বললেন ঃ

– হে রাসূল (সা.) আপনি এখনি আমাকে এই সত্যধর্মে দীক্ষা দিন।

মহানবী (সা.) তাঁর হাত ধরলেন। পাঠ করালেন তাওহীদের অমিয় বাণী– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

মহানবীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেই আবু বকর সোজা চলে এলেন বাড়ি। দেখলেন, আবু জাহেল ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা তখনো বসা। তিনি মুহাম্মদের (সা.) নতুন ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে কী ব্যবস্থা করে এলেন তা শোনার জন্য ব্যগ্র তারা। তারা ভাবলো, তিনি নিশ্চয় মুহাম্মদকে (সা.) শাসিয়ে এসেছেন। বিরত থাকতে বলেছেন ইসলাম প্রচার থেকে। কিন্তু আবুবকর (রা.) তাদেরকে হতাশ করলেন। বললেন অন্য কথা ঃ

– তোমরা চলে যাও। আজ হতে আমি আর তোমাদের দলে নেই। আমি মহাসত্য ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমি মুসলমান। এখন থেকে তোমাদের সাথে আমার আর কোনো সম্পর্কই থাকতে পারে না।

আবু বকরের (রা.) কথা শুনে খুবই অবাক হলো ওরা। রাগ ও আপমানে জ্বলতে লাগলো তাদের শরীর। কিন্তু করার কিছুই নেই। তাই আর কিছু না বলে চলে গেলো তারা।

www.pathagar.com

হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)

পঞ্চম হিজরী।

শাওয়াল মাস। যুদ্ধ সাজে আবার তৈরী হলো মক্কার কুরাইশরা। গোটা আরবের সম্মলিত শক্তি নিয়ে মদীনা আক্রমণ করতে আসছে তারা। দশ হাজার সৈন্যের সে বিশাল বাহিনী। এ দুঃসংবাদ দূরত্বের বাধা পেরিয়ে পৌঁছে গেলো মদীনায়। মহানবীর (সা.) কাছে। তাই তিনিও তৈরী হলেন। পরিখা খনন করলেন মদীনার তিন অরক্ষিত সীমানা জুড়ে। তাদের প্রতিরোধ করতে তিনি তিন হাজার সাহাবা সৈন্যের বাহিনী প্রস্তুত করলেন।

এমন সময় আরেক অঘটন ঘটলো। মুসলমানদের সাথে পূর্বের সন্ধি চুক্তি বাতিল করলো মদীনার বনু কুরাইজার ইহুদীরা। যোগ দিলো তারা কুরাইশদের দলে। এ অসময়ে এ বিশ্বাসঘাতকতা কেন? কেনো তারা ঘুরে দাঁড়ালো? কেনো তারা প্রতিপক্ষ হয়ে উঠলো মুসলমানদের? এ ভাবনার অশুভ প্রতিধ্বনি হলো নবীর (সা.) হৃদয়ে। তিনি আরো ভাবলেন এই গোত্রের প্রতিঘাত অনাগত যুদ্ধের জন্য পরাজয়ের কালিমা লেপন করতে পারে। তাই এর কারণ জানতে চাইলেন সমাগত সাহাবাদের কাছে। তাদের ভেতরের-বাইরের সব খোঁজ-খবর নিতে চাইলেন।

– কে তাদের খবর আনতে পারবে? পরপর তিনবার জিজ্ঞেস করলেন নবী (সা.)।

– আমি পারবো। তিনবারই সবিনয়ে জানালেন তরুণ সাহাবী যুবাইর (রা.)।

এতে খুব খুশী হলেন নবী (সা.)। তিনি খুশীর সাথে বললেন– 'প্রত্যেক নবীরই হাওয়ারী থাকে। আমার হাওয়ারী যুবাইর।'

চলে গেলেন যুবাইর (রা.)। বনু কুরাইজার পল্লীতে। সেই বিপদসংকুল পরিবেশে। খোঁজ-খবর নিলেন ইহুদীদের। তারপর ফিরে এসে নবীকে (সা.) জানালেন সবকথা। নবী আরো খুশী হলেন তাঁর প্রতি।

মহানবীর (সা.) প্রতি তাঁর এই বুকভরা ভালোবাসা, প্রভুর সত্যধর্মের নিবিড়

www.pathagar.com

আকর্ষণ তাঁকে ষোলো বছরের যুবক বয়সেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রেরণা যুগিয়েছিন। তখন রাসূলের (সা.) হাতে মাত্র চার-পাঁচ জন ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। মক্কায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার তখন সূচনা পর্ব মাত্র। বলা য়ায়, অবিশ্বাসের অমানিশায় একবিন্দু শুভ্র আলোর বিচ্ছুরণ। সেই শ্বেত-স্বচ্ছ বিশ্বাসের সাথে যোগ হলো আরেকটি আলোর কণিকা। যুবাইরের ইসলাম গ্রহণ।

যুবাইর জন্মেছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের বনু আসাদ গোত্রে। মহানবীর (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির ষোলো বছর আগে। তাঁর পিতা আওয়াম ইবনে খুওয়া ইলিদ, মাতা সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব। তাই পিতা-মাতা উভয় দিক দিয়ে তিনি ছিলেন মহানবীর (সা.) ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

তাঁর শৈশবেই আওয়ামের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব আসে আদর্শ মাতা-সাফিয়ার ওপর। আরব সমাজের সেই অরাজক যুগে। যে যুগে আরবদের কেন্দ্র শাসিত কোনো রাষ্ট্রিক জীবন ছিলো না, ছিলো গোত্রপতি শাসিত শতধা বিভক্ত গোত্রজীবন। যে জীবনে তাদের পারস্পরিক কোনো সদভাব ছিলো না, ছিলো শুধু গোত্রে গোত্রে শত্রুতা, বৈরিভাব। যার অশুভ ফল হতো গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ এবং বিরামহীন যুদ্ধ। যুদ্ধ ছিলো তাই অন্ধকার আরব সমাজের আবশ্যিক বিষয়। যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করতে হতো সবাইকে। আর এ বৃত্তিতে পারদর্শিতা অর্জনের উপকরণ ছিলো তিনটি ঃ শক্তি, সাহস ও কৌশল। এ তিন উপাদান নিয়ে এক এক জন আরব বড় যোদ্ধা হতো। প্রতিপক্ষকে আঘাত করতো, রক্ত ঝরাতো, ছিনিয়ে নিতো তার সবকিছু এমনকি হত্যাও করে বসতো প্রতিপক্ষ গোত্রের লোককে। তাই শক্তি, সাহস ও কৌশল– এই তিন গুণাবলী এক সাথে পেতে চাইতো প্রতিটি আরববাসী। প্রত্যেক পিতা– মাতাই স্বীয় সন্তানকে শক্তিমান, সাহসী ও সমর কুশলী রূপে দেখতে চাইতো। আর এসব গুণপনা নিজ পুত্রের জন্যে আরো বেশী করে কামনা করেছিলেন বীর-প্রসূ সাফিয়া। পুত্র যুবাইরকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখতেন তিনি। যুগোপযোগী স্বপ্ন ঃ যুবাইর বিপুল বল-বিক্রম-শক্তি, সাহসের অধিকারী হবে, প্রতি পক্ষের সাথে যুদ্ধে জয়ী হবে, লাভ করবে গনিমতের মাল–

www.pathagar.com

এমনি অনেক স্বপ্ন। তাই যুবাইরকে বাল্যকাল থেকেই কঠোর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন করতেন তিনি। কোন কোন সময় তাঁকে দুঃসাহসিক কাজের আদেশ করতেন। আর তা না পারলে কঠোর শাস্তি দিতেন তাঁকে। সাফিয়ার এই পুত্র শাসন গোত্রের সবাই বিশেষ করে যুবাইরের চাচা নওফেল ইবনে খুওয়াইলিদ একেবারই পছন্দ করতেন না। পিতাহারা ভাতিজার গায়ে কেউ হাত তুলুক– এটা তিনি আদৌ চাইতেন না। তাই অনেক সময় সাফিয়ার ওপর রাগ করতেন তিনি।

এক দিনের কথা। সাফিয়া খুব মারপিট করেছেন যুবাইরকে। এতে ভীষণ ক্ষিপ্ত হলেন নওফেল। তিনি সাফিয়াকে রাগত স্বরে বললেন– 'এভাবে মারতে মারতে ছেলেটিকে কোনদিন একেবার মেরেই ফেলবে তুমি।'

বকুনি দিয়েও খেদ মিটলো না তাঁর। সাথে সাথে গোত্রের লোকদেরও ডাকলেন তিনি। বললেন– 'তোমরা সাফিয়াকে বুঝাও না কেন?

নওফেলের এ খেদোক্তি শুনলেন সাফিয়া। সাথে সাথে তিনিও বললেন– 'যারা বলে আমি যুবাইরকে দেখতে পারি না, তারা মিথ্যা বলে। আমি তাকে এ জন্য মারধোর করি যাতে সে সাহসী হয় এবং পরিণত বয়সে শত্রু সৈন্যকে পরাজিত করে গণিমতের মাল লাভে সক্ষম হয়।'

এভাবে মায়ের কঠোর তত্ত্বাবধানে যুবাইর একটু একটু করে বড় হতে লাগলেন। কৈশোর পার না হতেই অমিত শক্তি ও সাহসের অধিকারী হলেন তিনি। কুস্তিগিরিতে হয়ে উঠলেন বিশেষ পারদর্শী। এতে তিনি এতোই নৈপুণ্য অর্জন করলেন যে বড় বড় পাহালয়ানও হার মানে তাঁর কাছে।

একদিনের ঘটনা। মক্কার এক তাগড়া জোয়ান মল্ল যুদ্ধের আহবান জানালো তাঁকে। তার আহবানে সাড়া দিলেন যুবাইর। ভীষণ কুস্তি শুরু হলো দু'জনার। এক পর্যায়ে তিনি লোকটিকে এমন মার দিলেন যে তার একটি হাত ভেঙে গেলো।

সেখানে উপস্থিত লোকেরা তো হতবাক। এতোটুকু ছেলের এই শক্তি। শেষ পর্যন্ত তারাই ধরাধরি করে সাফিয়ার কাছে নিয়ে এলো লোকটিকে। নালিশ জানালো যুবাইরের বিরুদ্ধে ঃ

– আপনার ছেলে এই লোকটির হাত ভেঙে দিয়েছে।

www.pathagar.com

– তোমরা যুবাইরকে কেমন দেখলে? ভীরু না সাহসী? জিজ্ঞেস করলেন সাফিয়া।

সাফিয়ার কথা শুনে বিস্মিত হলো সবাই। তাঁর ছেলেই লোকটিকে এভাবে আহত করলো। অথচ তিনি একটুও অনুতপ্ত হলেন না। সামান্য সমবেদনাও জানালেন না। উল্টো জিজ্ঞেস করছেন ছেলের বীরত্বের কথা। আশ্চর্য!

সময় বয়ে যায়। আরো বড় হন যুবাইর। সেই সাথে আরো শক্তিমান ও সাহসী হয়ে ওঠেন। এক সময় ষোলো বছর বয়স হলো তাঁর। আর তখনই মক্কায় তাওহীদের আওয়াজ তুললেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। তিনি ইসলামের পথে আহবান করতে লাগলেন তাঁর নিকটতম মানুষদের। তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন চার-পাঁচ জন। এই নব দীক্ষিতদের মধ্যে তাঁর প্রিয়বন্ধু আবুবকরও (রা.) একজন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনিও এই আলোর পথে ডাকতে লাগলেন তাঁর বন্ধুদের। ডাকলেন সত্যনিষ্ঠ যুবাইর ইবনে আওয়ামকে।

মুহাম্মদ (সা.) যুবাইরের ফুফাতো ভাই। আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। জন্ম থেকে দেখে আসছেন তাঁকে। সৎ ও সত্যবাদী বলে জানেন। জীবনে কোনদিন মিথ্যা বলতে শোনেন নি।

তাই আবু বকরের কথায় বিশ্বাসের পরশ স্পর্শ করলেন তিনি। তাওহীদের নির্মল আলো এসে বড়লো তাঁর মনের পর্দায়। আবুবকরের সাথেই মহানবীর (সা.) পবিত্র সংসর্গে চলে গলেন তিনি। ইসলামের সত্য বুকে ধারণ করলেন। যা ছিলো সময়ের সবচে' সাহসী পদক্ষেপ। কেননা তাঁর পরিবার, গোত্র, আত্মীয়-স্বজন, সমাজ, যুগ– সবই ছিলো তাঁর উল্টো দিকে, বিপ্রতীপ স্রোতে।

www.pathagar.com

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)

পঁয়ত্রিশ হিজরী।

জিলহজ্জ মাসের আঠারো তারিখ। শক্রবার। বেলা দ্বিপ্রহর। নিজ বাসভবনে অবরুদ্ধ খলিফা হযরত ওসমান (রা.)। বিদ্রোহীরা দীর্ঘ ছয়দিন যাবৎ ঘিরে রেখেছে তাঁর বাসগৃহ। এমনি অবস্থায় খলিফার খাদেম খ্যাতনামা সাহাবী আবু সাঈদ (রা.) আরজ করলেন ঃ

– হে আমীরুল মুমিনীন! যে সব পাপাত্মা আপনাকে অবরোধ করে রেখেছে, তারা যে কোন মুহূর্তে আপনাকে হত্যা করবে। তাই আপনার অনুমতি পেলে এক্ষুনি আমি বাইরে গিয়ে মদীনায় মুসলমানদের খবর দেই। সম্মিলিত আক্রমনে ভেঙে ফেলি ওদের অবরোধ।

– না। কারণ, আমি আজ রোজা রেখেছি। আর গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে আমাকে বলছেন– 'হে ওসমান! আগামী দিন তুমি আমাদের সাথে ইফতার করবে।' তাছাড়া জীবদদশায় তিনি (সা.) আমাকে বলছিলেন– 'ওসমান, তুমি মযলুম অবস্থায় শাহাদাতের পেয়ালা পান করবে।' আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজকের দিনটিই আমার সেই কাঙ্ক্ষিত দিন।

এই বলেই তিনি পরিধানের কাপড় পাল্টিয়ে নিলেন। পায়জামা পরলেন। তারপর কোরআন তেলওয়াতে মশগুল হলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রভুর চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য।

ইতোমধ্যে বিদ্রোহীদের কয়েকজন তাঁর বাড়ির আঙিনার প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকলো। দ্রুত এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। তাদের মধ্যে কেনান ইবনে বাশার লৌহদণ্ডের আঘাত করলো তাঁর মাথায়। খলিফা 'তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ' বলেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। এর ওপরই সাওদান ইবনে হামরান আঘাত হানলো আরেকটি। তাঁর মাথা ফেটে গেল। রক্ত ঝরলো অঝোর ধারায়। রঞ্জিত হলো পবিত্র কোরআনের সেই পঠিত আয়াতসমূহ। এবার আমর ইবনে হামাক তাঁর বুকে বসে বর্শায় ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো তাঁর পূত-পবিত্র দেহ। এই অবস্থায় আরেক পাপিষ্ঠ তরবারির জোরালো আঘাত হানলো তাঁর দেহে। আর

www.pathagar.com

তাতেই তাঁর প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। রক্তের অমলিন অক্ষরে চিহ্নিত হলো মহা নবীর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী। শহীদ হলেন মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা,আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম, মহানবীর (সা.) প্রিয় সহচর ও যিন-নূরাইন হযরত ওসমান (রা.)। ইসলামের সূচনা পর্বে সত্যের আলো বুকে ধারণ করার দুর্লভ বৈভবে উৎকীর্ণ যার নাম।

তাঁর জন্ম হয়েছিল পাঁচশ' ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে মক্কার কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখায়। পিতা আফফান ইবনে আবীল আস, মাতা আরওয়া বিনতে কুরাইজ। আফফান ছিলেন সমকালীন আরবদেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অন্যতম। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধন-সম্পদ, সততা, উদারতা, দানশীলতা– এ সবের জন্য সর্ব মহলে পরিচিত ও প্রশংসিত ছিলেন তিনি। তিনি মিশর, সিরিয়াসহ নানা দেশে বাণিজ্য করতেন। মুনফা পেতেন প্রচুর। যা অঢেল অর্থ– সম্পদের মালিক করে তুলেছিল তাঁকে।

ওসমান তাই ধনীর দুলাল হয়েই জন্মেছিলেন। প্রতিপালিত হতে থাকেন অতুল ঐশ্বর্যের মাঝে। পিতা-মাতার অপত্যস্নেহে। আফফান একমাত্র পুত্রের লেখাপড়ারও সুব্যবস্থা করেন। সেকালে শিক্ষাদীক্ষার আধুনিক রীতিনীতি ও সুযোগ-সুবিধা ছিলো না, ছিলো না কোন মক্তব-মাদ্‌রাসা। ছিলো কেবল গৃহভিত্তিক গুরুমুখী শিক্ষারীতি। আর এ ব্যবস্থা ছিলো শুধুমাত্র অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। শিশু ওসমানের জন্যও এ ব্যবস্থা করা হয়। বাড়িতে ওস্তাদের কাছে বিদ্যা শিখতে থাকেন তিনি। শিখতে থাকেন নানা বিষয়। কুরাইশদের কুষ্ঠীবিদ্যা, প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়। প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তাই অল্প দিনের মধ্যে নানা বিষয়ে অনেক জ্ঞান অর্জন করেন।

পিতৃস্নেহ সবার ভাগ্যে বেশী দিন হয় না। হলো না ওসমানেরও। এক বাণিজ্যিক সফরে গিয়ে আকস্মিক মৃত্যু হলো আফফানের। এতিম হলেন ওসমান। তখন তাঁর অভিভাবক হলেন চাচা হাকাম ইবনে আবীল আস। তারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হতে থাকেন তিনি।

দিন যায়। ধীরে ধীরে বড় হন ওসমান। সত্যের আলোহীন সেই অন্ধকার আরব সমাজে। শৈশব-কৈশোর পার হয়ে এক সময় যৌবন প্রাপ্ত হলেন তিনি। পরিণত হলেন সতেরো-আঠারো বছরের তারুণ্যদীপ্ত যুবকে।

www.pathagar.com

মধ্যম তাঁর দৈহিক গঠণ, উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রং, ঘন চুল, চওড়া বুক ও লম্বা হাত। চিত্তাকর্ষী চেহারা। সে চেহারা এতোই মনোমুগ্ধকর যে, মক্কার লোকেরা বলাবলি শুরু করলো– 'কেউ যদি নবী ইউসুফের (আ.) রূপরাশি দেখতে চায়, সে যেন কুরাইশ নেতা আফফানের পুত্র ওসমানকে দেখে আসে।'

শুধু দেহাবয়ব নয়, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও হয়ে ওঠে নির্মল, নিষ্কলুষ। লাজুক ও নম্র স্বভাব তাঁর। অমায়িক ব্যবহার। তিনি সৎ, সত্যবাদী, উদার ও দানশীল। তাঁর এসব মহৎ গুণাবলী সকলকে আকৃষ্ট করে, কাছে টানে। তাই সব সময় তাঁর পাশে ভিড় জমে মানুষের।

যৌবনকাল মানুষের জীবন সরণীর এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অর্থ-সম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতি লাভের উপযুক্ত সময়। অর্থ উপার্জনের পথ দুটি ঃ একটি সৎ, অন্যটি অসৎ। দ্বিতীয় পথটিতে ছিলো অন্ধকার যুগের অধিকাংশ আরবদের বিচরণ। সুদি কারবার, যুদ্ধ-বিগ্রহ, লুট-তরাজ, জুয়া- এসব ছিলো তাদের অর্থ অর্জনের মাধ্যম। তবে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসা করতো। বিশেষ করে কুরাইশ বংশের সবাই ব্যবসা-বাণিজ্যকে সর্বোত্তম ও সম্মানজনক পেশা বলে মনে করতেন। আফফান ইবনে আবীল আস ছিলেন মক্কার সবচে' বড় বণিক। ওসমানও যৌবনে চাচা হাকাম ইবনে আবীল আসের সহযোগিতায় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন তিনি। এতেই অভাবিত উন্নতি এলো। প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হলেন তিনি। পেলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনীর মর্যাদা। তখন তাঁর উপাধিহলো 'গণি'। 'ওসমান গণি' নামে পরিচিত হলেন সবার কাছে।

একদিকে আরবের সবচে' ধনবান মানুষ, অন্যদিকে উদার, দয়ালু ও দানশীল। গরীব-দুঃখীদের মাঝে দান করেন মুক্ত হস্তে। এসব কারণে কুরাইশরা সবাই তাঁকে ভালোবাসে, হামেশা প্রশংসা করে। তাঁর প্রতি কুরাইশদের ভক্তি-ভালোবাসা এতো গাঢ় যে, মায়েরা শিশুদের কান্না ভুলায় তাঁর নাম করে ঃ 'শপথ করে বলছি বাছা! কুরাইশরা ওসমানকে যেমন ভালোবাসে, তেমনি আমিও ভালোবাসি তোমায়।'

মক্কার কুরাইশদের মধ্যে আছেন আরেক বিখ্যাত বণিক। তাঁর নাম আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা। তিনিও সৎ, সত্যবাদী, উদার ও দানশীল। ধন-সম্পদ ও বদান্যতার জন্য তিনিও সুপরিচিত ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁর

www.pathagar.com

সাথেই ওসমানের গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। দুই বন্ধুই ব্যবসায়ী। তাই বাণিজ্যিক সফরে যান একসাথে। আবার পৃথক পৃথক ভাবেও যান কোনো কোনো সফরে।

একবার ওসমান গেলেন সিরিয়া সফরে। দীর্ঘ দিনের সে বাণিজ্যিক ভ্রমন। একদিন 'মুয়ান ও যারকার' মধ্যবর্তী স্থানে রাত্রি যাপন করছিলেন। গভীররাত। ঘুমিয়ে পড়েছে কাফেলার সবাই। ওসমানও। হঠাৎ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন তিনি। কে যেন তাঁকে ডেকে বলছেন– 'হে ঘুমান্ত ব্যক্তিরা! তাড়াতাড়ি কর। মক্কায় আহমদ নামের রাসূল আত্মপ্রকাশ করেছেন।'

ঘুম ভেঙে গেলো ওসমানের। বিস্ময়াভিভূত হলেন তিনি। এমন অদ্ভুত স্বপ্ন তো জীবনে কখনো দেখেন নি। এর অর্থ কি? সত্যি কি মক্কায় কোনো নবীর আবির্ভাব হয়েছে? মন উতালা হয়ে উঠলো তাঁর।

আর দেরী করলেন না তিনি। ফিরে এলেন মক্কায়। এসেই শুনলেন সত্য সংবাদ ঃ এক নতুন ধর্ম প্রচার করছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। এ ধর্মের সারকথা : আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। মুহাম্মদ মানুষকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার উপদেশ দিচ্ছেন। পরামর্শ দিচ্ছেন সব অন্যায়-অনাচার পরিহার করে সৎভাবে জীবন যাপন করার। তাঁর এসব উপদেশ মণ্ডিত কথামালা মক্কার বাতাসে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সর্বক্ষণ।

আর স্থির থাকতে পারলেন না ওসমান। চলে গেলেন তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু আবু বকরের কাছে। তাঁর ব্যগ্রভাব দেখেই আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– ভাই ওসমান! কি হয়েছে?

– আমি একটা ব্যাপার জানতে চাই।

– কি ব্যাপার?

– শুনছি, আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ নাকি এক নতুন ধর্মমত প্রচার করছেন। এক নিরাকার প্রভুর বন্দেগী করতে বলছেন।

– হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। তিনি পথ ভোলা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন।

– আপনি কি তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছেন? সাগ্রহে জানতে চাইলেন ওসমান।

– হ্যাঁ, আশাকরি আপনিও আর দেরী না করে আমাদের সাথী হবেন। গ্রহণ করবেন আলোকিত ধর্ম ইসলাম। বললেন আবু বকর।

www.pathagar.com

ওসমানের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। যৌবনের শেষ প্রান্তে উপনীত তিনি। জীবনের এ দীর্ঘ সময় পার হয়েছে তাঁর আলোহীন অন্ধকার আরব সমাজে। লৌকিক ধর্মের কালো পর্দায় ঢাকা সে সমাজদেহ। তাবৎ মানুষ তার সীমাহীন পাপ আর অনাচারে লিপ্ত। তিনি চান এ অশুভ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে। তাই তো কুরাইশদের জাহেলী রেওয়াজ-রীতি আগে থেকেই পরিত্যাগ করেন তিনি। তাদের মূর্তিপূজা, মদ্যপান, সুদ, জুয়া, কুৎসিত আমোদ-প্রমোদ– সব কিছুই এড়িয়ে চলতেন। অনুসন্ধান করতেন সঠিক পথ। আজ আবু বকরের কথায় সে পথের সন্ধান পেলেন তিনি। আনন্দে উদ্বোলিত হলো তাঁর অনুসন্ধানী অন্তর। সেই মুহূর্তে আবু বকরের সাথে মুহাম্মদের (সা.) কাছে যেতে চাইলেন তিনি।

আল্লাহর কী অশেষ রহমত! ঠিক তখনই মহানবী মুহাম্মদ (সা.) হাজির হলেন সেখানে। তিনি ওসমানের দিকে তাকিয়েই বললেন ঃ

– হে ওসমান! আল্লাহর মনোনীত ধর্ম গ্রহণ করো। আমি তোমাদের সকলকে পথ দেখাতে এসেছি।

– লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলল্লাহ। সাথে সাথে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন ওসমান (রা.)।

ইসলাম গ্রহণ করলেন ওসমান (রা.)। এতে উমাইয়া গোত্রের লোকেরা ভীষণ ক্ষিপ্ত হলো তাঁর প্রতি। এ গোত্রের সাথে মুহাম্মদের (সা.) হাশেমী গোত্রের ছিলো দীর্ঘদিনের বিরোধ, শত্রুতা। ওসমান উমাইয়া গোত্রের লোক হয়েও হাশেমী গোত্রের মুহাম্মদের (সা.) দলভুক্ত হয়েছে। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না তাঁর আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে তাঁর চাচা হাকাম। যে ছিলো তাঁর অভিভাবক, প্রতিপালনকারী। তারই নির্মম নির্যাতন নেমে এলো ওসমানের (রা.) ওপর। নিষ্ঠুর হাকাম তাঁকে রশি দিয়ে বাঁধতো, শক্ত করে। তারপর পিটাতে থাকতো, অবিরাম। সেই সাথে বলতো ঃ

– একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদাদের মুখে কালি দিয়েছো। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না।

– তোমাদের যা ইচ্ছা তা-ই করো। এ দ্বীন আমি কখনো ত্যাগ করতে পারবো না। জবাবে বলতেন হযরত ওসমান (রা.)।

www.pathagar.com

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা.)

তৃতীয় হিজরী।

শাওয়ালের পনেরো তারিখ। মক্কার মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের প্রচণ্ড লড়াই চলছে ওহুদ প্রান্তরে। মুসলিম বাহিনীর তীব্র আক্রমনে অবিশ্বাসীরা যখন প্রায় পরাজিত-পর্যুদস্ত, ঠিক তখনই এক ভুল করে বসলেন মুসলিম বাহনীর পাহাড়ের গিরিপথে দাঁড়ানো তীরন্দাজ সৈন্যরা। রণ কুশলী নবীর (সা.) আদেশ ভুলে গিরিপথ ছেড়ে গনিমত সংগ্রহে লিপ্ত হলেন তাঁরা। অরক্ষিত হয়ে গেলো সেই প্রবেশ পথ। শত্রু সেনারা এটাকে এক সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে করলো। মুক্ত পথে বণ্যা স্রোতের মতো ঢুকে পড়লো ময়দানে। অতর্কিত আক্রমন করলো মুসলিমদের। যার জন্য তাঁরা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে শহীদ হতে লাগলেন একের পর এক। বেশীর ভাগই হয়ে ছিলেন দিশেহারা। তাঁরা প্রাণের মায়ায় পালাতে লাগলেন নিকটবর্তী পাহাড়ের দিকে। মহানবী (সা.) তখন যুদ্ধ-ময়দানের মাঝখানে। হযরত তালহা (রা.) সহ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী ঘিরে রেখেছেন তাঁকে। এটা বুঝতে পারলো শত্রুরা। তখন তিনিই হলেন তাদের লক্ষ্যস্থল। চারিদিক থেকে বৃষ্টির মতো তীর ছুড়তে লাগলো তাঁর দিকেই।

এমনি সংকট সন্ধিক্ষণে তালহা (রা.) নিলেন এক আশ্চর্য পদক্ষেপ। প্রাণের নবীকে (সা.) রক্ষা করতে নিজের দেহকে ঢাল বানালেন তিনি। নবীর (সা.) প্রতি নিক্ষিপ্ত তীর ধরতে লাগলেন হাত দিয়ে। সেই সাথে চালাতে লাগলেন শত্রুর প্রতি আক্রমণ। আক্রমণে যাচ্ছেন, আবার ফিরে আসছেন নবীর (সা.) পাশে। ধরছেন বিষাক্ত তীর। ধরলেন এক এক করে বিশটি। নষ্ট হয়ে গেলো তাঁর এক হাত। সারা শরীরে বল্লম, তরবারি ও তীরের আঘাত লাগলো পঁচাত্তরটি। একটি প্রচণ্ড আঘাত পেলেন মাথায়। ইত্যেমধ্যে তাঁর সহযোদ্ধারা প্রায় সকলেই শহীদ হয়েছেন। এই জীবন-মরণ সন্ধিক্ষণে তিনি প্রাণতুল্য নবীকে (সা.) কাঁধে তুলে নিলেন। নিয়ে গেলেন পর্বত-গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে। এভাবে ওহুদ-যুদ্ধে সেই চরম বিপর্যয়কর মুহূর্তে অসীম বীরত্ব ও রাসূল-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন হযরত তালহা (রা.)। আর তা চির ভাস্বর

www.pathagar.com

হয়ে রইলো ইতিহাসে। শুধু ওহুদ-যুদ্ধে নয়, ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও বড়ই চমকপ্রদ ও চিরস্মরণীয়।

তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের তাঈম গোত্রেরই সন্তান। পিতা উবাইদুল্লাহ ইবনে উসমান। মাতা সাবা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক আল-হাদরামী। জন্মেছিলেন পাঁচশ' পঁচা নব্বই খ্রিস্টাব্দের দিকে। মহানবীর (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির প্রায় পনেরো বছর আগে।

আবু বকর ইবনে আবু কুহাফাও ছিলেন এই তাঈম গোত্রেরই সন্তান। তালহার চাচাতো ভাই তিনি। কীর্তিমান পুরুষ তিনি। ব্যবসা-বাণিজ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, টাকা-পয়সা, জ্ঞান-গরিমা, দান-দক্ষিণা, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা– সবকিছুতে গোটা আরব জুড়ে সুনাম তাঁর। তালহা বাল্যকালেই এই মহান ব্যক্তির নিবিড় সান্নিধ্যে আসেন। তিনি সব সময় তাঁরই সাথে থাকতেন, বেড়াতেন, আলাপ-আলোচনা করতেন। আবু বকর ছিলেন একজন সৎ পরামর্শ দাতাও। তাঁর কাছে পরামর্শ নিতে আসতো সবাই। তাঁর বাড়িতে বৈঠক বসতো। সে বৈঠকে নিয়মিত হাজির দিতেন তালহা। পরামর্শ নিতেন নানা বিষয়ে বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে। ফলে অল্প বয়সেই একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী হিসেবে গড়ে ওঠেন তিনি। ব্যবসা করতে থাকেন যোগ্যতার সাথে।

এক সময়ের ঘটনা। তালহার বয়স তখন পনেরো-ষোলো বছর। ব্যবসা উপলক্ষ্যে গেছেন সিরিয়ায়। কুরাইশ ব্যবসায়ীদের সাথে। বসরা শহরে পৌঁছালেন তাঁরা। এ সময় দলের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাঁর থেকে। বাজারের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কেনা-বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো তারা। তখন তিনি একাকী ঘুরাফেরা করতে লাগলেন বাজারের মধ্যে। হঠাৎ এক খৃষ্টান পাদরীকে ঘোষণা করতে শুনলেন– 'হে ব্যবসায়ীরা! আপনারা এ বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞেস করুণ, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোন লোক আছে কিনা।'

তালহা নিকটেই ছিলেন। তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। বললেন– হ্যাঁ, আমি মক্কার লোক। বলেন, কী বলতে চান।'

– তোমাদের মধ্যে কি আহমদ আত্মপ্রকাশ করেছেন? জিজ্ঞেস করলেন পাদরী।

– কোন আহমদ?

– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তলিবের ছেলে। যে মাসে তিনি আত্মপ্রকাশ

www.pathagar.com

করবেন, এটা সেই মাস। তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর উদ্যান বিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। যুবক, খুব তাড়াতাড়ি তোমার দেশে ফেরা উচিত। বললেন পাদরী।

পাদরীর কথাগুলো দারুণ প্রভাব ফেললো তালহার তরুণ মনে। তিনি আর দেরী করলেন না। দলের ব্যবসায়ীদের রেখেই সওয়ার হলেন ঘোড়ার পিঠে। যাত্রা করলেন বাড়ির দিকে।

পথে দেখা হলো মক্কার সবচে' বড় ব্যবসায়ী ওসমান ইবনে আফফানের সাথে। তিনিও ফিরছিলেন সিরিয়া থেকে। তালহা তাঁর কাছে ঘটনাটি বললেন। তিনি আরো বললেন, 'আহমদ' আসলে হাশিম গোত্রের 'মুহাম্মদ' ইবনে আব্দুল্লাহ। তখন ওসমানও তাঁকে জানালেন তাঁর একটি স্বপ্নের কথা ঃ সিরিয়ার এক জনহীন প্রান্তরে ঘুমাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ স্বপ্নে শুনতে পেলেন একটি কণ্ঠস্বর ঃ 'নিদ্রামগ্নরা, জেগে ওঠো। কারণ, নিঃসন্দেহে মক্কায় আহমদের আগমন ঘটেছে।'

ওসমানের কথা শুনে বিস্ময় ও বিশ্বাস আরো বেড়ে গেলো তালহার। তিনি দ্রুত বাড়ি চলে এলেন। পরিবারের লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– আমার যাবার পর মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি?

– হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন। আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তাঁর অনুসারী হয়েছেন।

আর স্থির থাকতে পারলেন না তালহা। চলে গেলেন আবু বকরের কাছে। তাঁর সবচে' অন্তরঙ্গ মানুষ তিনি। সৎ ও সত্যবাদী। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– একথা কি সত্য যে, মুহাম্মদ নবুয়ত দাবী করেছেন? আর আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন?

– হ্যাঁ, তুমিও এই সত্য ধর্ম গ্রহণ করে নাও।

তালহার অবিশ্বাসের পাথরে আঘাত লেগেছিলো আগেই। এবার তা ভেঙে খান খান হলো। বিশ্বাসের অনির্বাণ আলোয় পূর্ণ হলো তাঁর অন্তর। আবু বকরের সাথে তখনই চলে গেলেন মহানবী (সা.) পবিত্র সান্নিধ্যে। তাঁর হাতে হাত রেখে ঘোষণা করলেন তাওহীদের চিরন্তন বাণী ঃ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

www.pathagar.com

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)

ষষ্ঠ হিজরী।

শাবান মাস। মদীনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে দুমাতুল জান্দাল জনপদের খৃষ্টান অবিশ্বাসীরা। ইসলামের কট্টর দুশমন তারা। মহানবী (সা.) তাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠাতে চাইলেন। এ অভিযানে সেনাপতির গুরুভার বহনের জন্য তৈরী হতে বললেন তাঁর এক প্রিয় সাহাবীকে। যিনি ছিলেন ওহুদ যুদ্ধে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত, খঞ্জ।

পরদিন সকালেই কালো পাগড়ী মাথায় নবীর (সা.) খেদমতে হাজির হলেন তিনি। নবীজী পাগড়ী খুলে নিজ হাতে আবার বেঁধে দিলেন। বেলালের (রা.) কাছ থেকে ইসলামী পতাকা নিয়ে অর্পণ করলেন তাঁর হাতে। তারপর দিলেন যুদ্ধের প্রয়োজনীয় নির্দেশ। সবশেষে বললেন– 'শত্রুরা যদি আনুগত্য স্বীকার করে, তবে তুমি তাদের দলপতির কন্যাকে বিয়ে করবে।'

সাতশ' সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন তিনি। অবিরাম পথ চলে এক সময় পৌঁছে গেলেন মদীনা হতে প্রায় তিনশ' মাইল দূরে দুমাতুল জান্দাল জনপদে। এখানকার অধিবাসীদের তিন দিন ধরে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানালেন তিনি। চতুর্থ দিনে তাদের দলপতি কালব গোত্রজ আসবাগ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করলেন। সেই সাথে তাঁর অনেক অনুসারীও। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করলো না, তারা জিযিয়া কর দিতে রাজী হলো। মহানবীর (সা.) নির্দেশে সেনাপতি এবার আসবাগের কন্যাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। আসবাগও সানন্দে রাজী হলেন। কন্যা তুমাদিরকে বিয়ে দিলেন তাঁর সাথে।

প্রিয় নবীর (সা.) এ প্রিয় সাহাবীর নাম আব্দুল রহমান ইবনে আউফ (রা.)। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যার নাম ছিলো আবদে আমর। আর তিনি তাওহীদের আলোর পথে এসেছিলেন ইসলাম প্রচারের একেবার শুভ সূচনায়।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের আশির দশকে মক্কার কুরাইশ বংশের যুহরা গোত্রে

www.pathagar.com

জন্মেছিলেন তিনি। পিতা আউফ, মাতা শিফা বিনতে আউফ। জন্মের পর পিতা-মাতা তাঁর নাম রাখেন আবদে আমর। আর এই নামেই বড় হতে থাকেন তিনি।

সে যুগে যুহরা গোত্র ছিলো কুরাইশ বংশের মধ্যে সবচে' পশ্চাৎপদ, প্রভাহীন। লোকসংখ্যা, ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা-কোন দিক দিয়ে এ গোত্রের উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কাবা বা হারাম শরীফের তত্ত্বাবধানের কোন পদও এ গোত্রের ভাগে পড়েনি কখনো। সকল সুবিধা বঞ্চিত এ গোত্রের লোকদের তাই সব সময় নির্ভর করতে হতো ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর। ব্যবসা করতেন প্রায় সবাই। আবদে আমরের পিতা আউফও ছিলেন বড় ব্যবসায়ী। নানা দেশে ব্যবসা করতেন তিনি। অনেক বাণিজ্যক সফরে পুত্রকেও নিয়ে যেতেন সাথে।

একবার পিতার সাথে ব্যবসা ব্যপদেশে ইয়েমেনে গেলেন আবদে আমর। এই সফরে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মক্কার আরো দুই বিখ্যাত ব্যবসায়ী– ওসমানের (রা.) পিতা আফফান ও খালিদ বিন ওয়ালীদের (রা.) চাচা ফাকিহ্ বিন মুগীরা। পথিমধ্যে ঘটলো এক মর্মান্তিক ঘটনা। বনু জাযী গোত্রের লোকেরা আক্রমন করলো তাদের। তাতে নিহত হলেন আউফ ও ফাকিহ্। আবদে আমর তখন এক অমিততেজ তরুণ। তাই তিনিও ছেড়ে দিলেন না। বীর-বিক্রমে ঝাপিয়ে পড়লেন খুনীদের ওপর। চরম বদলা নিলেন পিতৃ হত্যার।

শুধু দৈহিক শক্তি– সামর্থ্য নয়, যৌবনে আরো অনেক মহৎ গুণপনার সমাবেশ ঘটে তাঁর চরিত্রে। তিনি হয়ে ওঠেন সৎ, সত্যবাদী, ভদ্র, উদার, নিয়ম নিষ্ঠ ও সৎসঙ্গ প্রিয়। মক্কার সৎ ব্যবসায়ী আবুবকরের সাথে তাই তাঁর গড়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।

আবু বকরের অনুপম চরিত্র মাধুরী তাঁকে সব সময় কাছে টানতো, আকর্ষণ বাড়াতো। তাই প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন তিনি। তাঁর বাড়িতে অনুষ্ঠিত পরামর্শ বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। শুনতেন আস্থাভাজন বন্ধুর মতামত ও পরামর্শ। আর তা মেনে চলতেন তিনি। এভাবে তাঁর সুন্দর চরিত্র আরো সুন্দর হয় প্রিয় বন্ধু আবু বকরের সংসর্গে। আবু বকরের মতো

www.pathagar.com

তিনিও আরবদের জাহেলী কর্মকাণ্ডকে ঘৃণা করতে শেখেন। ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেন তাদের মূর্তিপূজা ও মদ্যপান।

সময় পার হয়। একটি একটি দিন, মাস, বছর। এক এক করে ঊনত্রিশটি বছর পেরিয়ে গেলো আবদে আমরের জীবন থেকে।

ত্রিশ বছরে পদার্পণ করলেন তিনি। তখনই ইতিহাসের সবচে' আলোকোজ্জ্বল ঘটনা মক্কায় ঘটলো। নবুয়ত পেলেন মুহাম্মদ (সা.)। হেরা গুহায় অভিষেকের পরই তিনি মক্কার মানুষের মধ্যে সংগোপনে প্রচার করতে লাগলেন তাওহীদের বাণী। তখনো সাফা পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আরকামের গৃহকে গোপন প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করেন নি তিনি। ইতোমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন প্রায় বারো জন। সেসব সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন হলেন মুহাম্মদের (সা.) প্রিয় বন্ধু আবুবকর (রা.)। যিনি ছিলেন আবদে আমরেরও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর তাঁর বন্ধুদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন ইসলামের। তিনি আবদে আমরকেও আহবান জানালেন। আমরও সাড়া দিলেন। কেননা নবুয়তের দাবীদার মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে অতি উচ্চ ধরণা পোষণ করেন তিনি। সকল মহৎ গুণে গুণান্বিত মুহাম্মদ (সা.)। সকলের বিশ্বাসী, আল-আমীন। তাঁর নিকটতম বন্ধু আবু বকর, যিনি সকলের পরামর্শদাতা, তাঁর প্রচারিত ধর্মমত গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি আর দেরী করলেন না। আবু বকরের সাথে চলে গেলেন। মুহাম্মদের (সা.) পবিত্র সান্নিধ্যে। তাঁর হাতে হাত রেখে উচ্চারণ করলেন তাওহীদের মর্মবাণী ঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

ইসলামে দীক্ষা দেয়ার পর নবীজী তাঁর জাহেলী যুগের 'আবদে আমর' নামটি পরিবর্তন করলেন। রাখলেন আল্লাহর সবচে' পছন্দের নাম– আব্দুর রহমান। আর এই নামেই পরিচিত হয়ে উঠলেন তিনি। ইতিহাসে পাতায় চির উজ্জ্বল রেখায় চিহ্নিত হলো সে পরিচিতি ঃ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)।

www.pathagar.com

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াককাস (রা.)

পারস্যের রাজধানী মাদায়েনের পথে ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চলেছেন এক মুসলিম সেনাপতি। খলিফা ওমরের (রা.) নির্দেশে মাদায়েন জয় করতে যাচ্ছেন তিনি।

তাইগ্রিস নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরের সুন্দর দুটি শহর নিয়েই রাজধানী মাদয়েন। পশ্চিম তীর অবরোধ করলেন তিনি। সে অবরোধ স্থায়ী হলো দীর্ঘ দুই মাস। তারপর অগ্রসর হলেন পূর্ব তীর বিজয়ে। হঠাৎ সামনে পড়লো বিশাল তাইগ্রিস নদী। দু'কুল উপচে পড়া-খরস্রোতা সে নদী। পারাপারের ও কোন ব্যবস্থা নেই। সব বন্দ করে দিয়েছে পারসিকরা। পুলটি পূর্বেই ধ্বংস করে ফেলেছে। নৌকাগুলো সব নিয়ে গেছে ওপারে। তবু এই উত্তাল তরঙ্গমালা পার হয়ে যেতে হবে পূর্ব পারে। জয় করতে হবে রাজধানী। দখলে আনতে হবে রাজ প্রাসাদ। উৎখাত হবে জালেম শাসকের দুঃশাসন। ইসলামী বিধানের আওতায় আসবে গোটা ইরাক। মুক্তি পাবে আল্লাহর বান্দারা। সেনাপতি সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বজ্র কণ্ঠে বললেন– 'মুসলমান ভাইসব! শত্রুরা শেষ পর্যন্ত নদীর ওপারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তোমরা যদি ওদের এই আড্ডাটি ভেঙ্গে দিতে পার, তবে আপাততঃ ইরাক হতে ওদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে।'

এই বলেই তিনি নিজের ঘোড়াসহ ঝাপ দিলেন সেই তরঙ্গ বিমুদ্ধ স্রোতস্বিনীর বুকে। সাথে সাথে অশ্বারূঢ় সমস্ত সৈন্যরাও অনুসরণ করলো তাঁকে। ঘোড়াসহ ঝাঁপিয়ে পড়লো। চলতে লাগলো স্রোতের বেগে। এক জনের পেছনে আরেক জন, এক জনের পাশে আরেক জন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। পারসিকদের কানেও গেলো এ খবর। ছুটে এলো তারা। তীরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো মুসলমানদের এ দুঃসাহসিক কাণ্ড। বিস্ময়ে হতবাক তারা। 'একী কাণ্ড। এরা মানুষ না অন্যকিছু?'

অনেখক্ষণ দেখলো তারা। কেঁপে উঠলো তাদের অবিশ্বাসী অন্তর। শেষ পর্যন্ত 'দৈত্য আসছে, দৈত্য আসছে' বলে চিৎকার করে রাজধানী ছেড়ে পালাতে লাগলো তারা। পালিয়ে গেলো সবাই। সম্রাট ইয়াজদগীরদও। তিনি আশ্রয় নিলেন হালওয়ানে গিয়ে। পরিবার-পরিজন নিয়ে।

www.pathagar.com

মুসলিম বাহিনী নিয়ে ক্লান্ত, সিক্ত শরীরে তীরে উঠলেন সেনাপতি। তারপর এগিয়ে চললেন জনবিরল শহরের দিকে। মনুষ্যহীন এই বিস্তীর্ণ পরিসরের শহরে দাঁড়িয়ে আছে পারস্য সম্রাটের সুউচ্চ-সুরম্য শাহী প্রাসাদ। তিনি প্রবেশ করলেন সেই প্রাসাদে। প্রভু নিয়ন্তাকে স্মরণ করলেন। কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হলো তাঁর হৃদয়। আদায় করলেন শোকরানার নামাজ। এবার প্রাসাদের ছাদে প্রোথিত করলেন ইসলামের বিজয় পতাকা।

যে মহান মুসলিম সেনাপতির নেতৃত্বে এ চমকপ্রদ মাদায়েন জয় হয়েছিল, পারস্যের শাহী প্রসাদের ছাদে ইসলামের বিজয় পতাকা পত পত করে উড়েছিল, তাঁর নাম সা'দ বিন আবি ওয়াককাস (রা.)। রাসূলের (সা.) গোপন ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্বের বিশ্বাসী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটিও অতি চমকপ্রদ, বিস্ময়কর।

সা'দের বয়স তখন মাত্র সতেরো বছর। সবেমাত্র নবুয়তের অভিষেক হয়েছে মহানবীর (সা.)। দাওয়াতে হকের কাজও শুরু করেছেন তিনি। কুরাইশদের মধ্য থেকে কিছু বিশ্বস্ত মানুষকে গোপনে ইসলামের পথে ডাকছেন তিনি। ইতোমধ্যে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন ছয়-সাতজন সোনার মানুষ। এমন সময় একরাত্রে বিস্ময়কর এক স্বপ্ন দেখলেন সা'দ ঃ

অন্ধকার রজনী। সামনের দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হঠাৎ আকাশে উদয় হলো পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র। তিনি ছুটে চলেছেন সে চাঁদের দিকে। দেখলেন, তাঁর আগেই এ গন্তব্যে পৌঁছেছেন আলী ইবনে আবু তালিব, যায়েদ ইবনে হারিসা ও আবু বকর ইবনে আবু কুহাফা। স্বপ্ন-বিভোর অবস্থায় তাঁদের দিকে তাকালেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– আপনারা এখানে কতোক্ষণ এসেছেন?

– এই তো এক্ষুনি। বললেন তাঁরা।

ঘুম ভেঙে গেলো সা'দের। অবাক-বিস্ময়ে অভিভূত হলেন তিনি। 'এ কেমন স্বপ্ন! এর অর্থ কি?' ভাবতে লাগলেন সা'দ।

এর কয়েক দিন পরই তিনি জানতে পারলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নবুয়তের দাবী করেছেন। গোপনে ইসলাম প্রচার করছেন তিনি। তাঁর প্রচারিত সত্য গ্রহণ করেছেন আলী ইবনে আবু তালিব, যায়েদ ইবনে হারিসা, আবুবকর ইবনে আবু কুহাফা প্রমুখরা।

www.pathagar.com

গভীর বিশ্বাস এলো সা'দের অন্তরে। আর কোন চিন্তা-ভাবনা করলেন না তিনি। তখনই ছুটে চললেন নবীর (সা.) সন্ধানে। সত্য প্রচারের তখন সাত দিন অতিবাহিত হতে যাচ্ছে। আসরের সময় উত্তীর্ণ। পড়ন্ত সূর্যের ম্লান আলোকরশ্মি যেনো আলোর আহবান জানাচ্ছে তাঁকে। 'আজইয়াদ' ঘাঁটিয়ে মহানবীর (সা.) সান্নিধ্যে এলেন তিনি। নবীর (সা.) পবিত্র হাত স্পর্শ করলো তাঁর হাত দুখানি। গ্রহণ করলেন ঈমানের কালেমা ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

সা'দের এই ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তাঁর মা হামনা খুব ক্ষুব্ধ হলেন। যিনি ছিলেন ইসলামের কট্টর বিরোধী। দারুণ হৈ চৈ ও বিলাপ শুরু করলেন তিনি। অবশেষে করে বসলেন এক কঠিন প্রতিজ্ঞা ঃ

– সা'দ যতক্ষণ মুহাম্মদের রিসালাতের অস্বীকৃতির ঘোষণা না দেবে, ততক্ষণ আমি কিছু খাব না, কিছু পান করব না, রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য ছায়াতে আসব না। মার আনুগত্যের হুকুম তো আল্লাহও দিয়েছেন। আমার কথা না শুনলে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং মার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

তিনি করলেনও তাই। তিন দিন পর্যন্ত কিছু খেলেন না, কারো সাথে কথা বললেন না, রোদ থেকে ছায়াতেও এলেন না। মায়ের এমনি অবস্থায় বড় অস্থির হয়ে পড়লেন সা'দ। তিনি হাজির হলেন রাসূলের (সা.) খেদমতে। খুলে বললেন সব কথা। রাসূলের কাছ থেকে জবাব আসার আগেই আল্লাহ নাযিল করলেন সূরা আল-আনকাবুতের অষ্টম আয়াত– 'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।,

এবার মানসিক অস্থিরতা দূর হলো সা'দের। মাকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন– 'মা, আপনার মতো হাজারটি মা-ও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার ব্যাপারে জিদ ধরে খাদ্যও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত হয়, প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবু সত্য দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।'

এই সা'দই আশারায়ে মোবাশ্‌শারা। জান্নাতের অগ্রিম সনদ প্রাপ্ত সোনার সাহাবা। পারস্য বিজয়ের অমিত তেজা সেনানায়ক, ইসলামের প্রথম পর্বের কালেমা গ্রহণকারী, বিশ্বনবীর (সা.) আজীবন সঙ্গী। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সোনালী স্তম্ভে তাঁর নাম চির ভাস্বর হয়ে রইবে।

www.pathagar.com

হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা.)

দ্বিতীয় হিজরী।

রমজানের সতেরো তারিখ। শুক্রবার। বদর প্রান্তরে অস্ত্রের ঝনঝনানি আর মানুষের উতরোল। তুমুল যুদ্ধ চলছে। একদিকে হক, অন্যদিকে বাতিল। একদিকে ইসলাম, আরেক দিকে কুফল। একদিকে মদীনার মাত্র তিনশ' তেরো জন মুসলিম সৈন্য, অন্যদিকে মুশরিকদের এক হাজার সৈন্যের বিশাল বাহিনী। অভূতপূর্ব সে দৃশ্য। পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে জিঘাংসা নিয়ে লড়ছে, শানিত অস্ত্র দিয়ে আঘাত করছে। রক্তের সম্পর্কের আজ আর কোন মুল্য নেই। একমাত্র ঈমানের সম্পর্কই পরম প্রিয় ও অপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মুসলিম বাহিনী লড়ছে মহানবীর (সা.) মহান নেতৃত্বে। শাহাদাতের অমলিন স্পৃহা নিয়ে। দীপিত-ঈমান নিয়ে। তাদের তীব্র আক্রমনে ভীত-সন্ত্রস্ত কাফির বাহিনী। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দলে দলে পলায়ন করছে তারা। আশ্রয় নিচ্ছে নিকটবর্তী পাহাড়ে গিয়ে। আর সম্মুখ সমরে যারা আসছে তারা প্রাণ হারাচ্ছে প্রিয় নবীর (সা.) প্রিয়' সাহাবী সৈন্যদের হাতে। এমনি অবস্থায় এক সাহাবী সৈন্য এক কাফির সৈন্যকে হাতের কাছে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছেন বার বার। কে এই কাফির সৈনিক? সাহাবীর পিতা। নাম আব্দুল্লাহ ইবনে জাররাহ। কট্টর ইসলাম বিরোধী সে। মক্কী বাহিনীর পক্ষ হয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করছে সে। বার বার পুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে ভৎর্সনা করছে। পুত্রও প্রতিবার তার সামনে থেকে সরে যাচ্ছেন। এক সময় সে ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করলো। সাহাবী সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে, সে কাফির বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে পুত্রকে প্রতিহত করতে লাগলো। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো সাহাবীর। তরবারি চালালেন সজোরে। দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো তাঁর পিতার। আর এতে মহানবী (সা.) তো বটেই, স্বয়ং আল্লাহ পাকও খুব খুশী হয়ে গেলেন। আয়াত নাযিল করলেন আল-কুরআনে।

কে এই সাহাবী? আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রা.)। সাবেকীনে আউয়ালীন। প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণ কারীদের অন্যতম।

কুরাইশ বংশের বনু ফিহর শাখার সন্তান তিনি। জন্মে ছিলেন মহানবীর (সা.) হিজরতের চল্লিশ বছর আগে। জাহেলিয়াতের জাকালো অন্ধকারে।

www.pathagar.com

এই অশুভ আবহে কাটে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের এক দীর্ঘ সময়। আবু উবাইদা তখন আঠাশ বছরের যুবক। মক্কায় ঘটলো ইতিহাসের সবচে' কল্যানদীপ্ত ঘটনা। ইসলামের আলো নিয়ে এলেন মহানবী মুহাম্মদ (সা.)। সাথে সাথে সে আলো ছড়াতে লাগলেন তিনি। গোটা আরব জুড়ে তখন মিথ্যা ও অবিশ্বাসের অন্ধকার। শিরক ও কুফরীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত তাবৎ মানুষ। এমনি অবস্থায় আম জনতার মধ্যে প্রকাশ্যে ঐশী বাণী প্রচার করতে গেলে সমস্যা দেখা দিতে পারে, হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হতে পারে। তাই তিনি গোপনে নিজ বংশের নিকটতম মানুষদের মধ্যে তাওহীদের বানী প্রচার করতে লাগলেন। ইসলামের আলোকিত পথে ডাকতে লাগলেন পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের'। তাঁর আহবানে প্রথম সাড়া দিলেন চারজন। তাঁর জীবন সঙ্গিনী খাদিজাতুল কুবরা (রা.), চাচাতো ভাই আলী (রা.), পালিত পুত্র যায়েদ (রা.) ও বন্ধু আবু বকর (রা.)। ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর-ও (রা.) সত্য প্রচারে ব্রতী হলেন। দাওয়াত দিতে লাগলেন তাঁর বন্ধু মহলে। তাঁর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করলেন উসমান (রা.), যুবাইর (রা.), আব্দুর রহমান (রা.), সা'দ (রা.) ও তালহা (রা.)। এরপর আবু বকর (রা.) দাওয়াত দিলেন আবু উবাইদা কে। তিনিও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নম্র-ভদ্র, লজ্জাশীল, চরিত্রবান ও সুদর্শন যুবক। বিবেক, বুদ্ধি ও মেধার দিক দিয়েও উন্নত। মক্কার মানুষদের সম্পর্কে সম্যক জানেন তিনি। আরবভূমির সর্বোত্তম পুরুষ মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকই অতি উন্নত। নবুয়তের মাপকাঠিতে গঠিত। এমন মানুষই তো নবী হবেন। ভাবলেন আবু উবাইদা। তাই তিনি আবু বকরের আহবানে সাড়া দিলেন। ইসলাম গ্রহণ করলেন তাঁর হাতেই। তারপর তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), উসমান ইবনে মাজউন (রা.), আরকাম ইবনে আবিল আরকান (রা.), ও আবু বকরকে (রা.) সাথে নিয়ে হাজির হলেন মহানবীর (সা.) দরবারে। সেখানে সকলেই একযোগে ঘোষণা দিলেন ইসলামের।

তাওহীদের চির উদ্ভাসিত জীবন পেলেন আবু উবাইদা (রা.)। এ জীবনে উত্তর উত্তর এলো আরো প্রাপ্তি, আরো মর্যাদা। পেলেন প্রিয় নবীর (সা.) নিবিড় সান্নিধ্য, বেহেশতের আগাম খোশ খবর, নবীর (সা.) পবিত্র মুখ নিঃসৃত 'আমীনুল উম্মাহ' উপাধিসহ আরো অনেক সুমহান মর্যাদা। মহানবীর (সা.) পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও প্রধান সেনাপতি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের অধিকর্তা হন এই মহান সাহাবী।

www.pathagar.com

হযরত সাঈদ ইবনে যায়িদ (রা.)

ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর খলিল। বন্ধু। আল্লাহর মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই দুনিয়ায় এসেছিলেন তিনি। আজীবন প্রচার করেছিলেন আল্লাহর একত্ববাদের অমিয় বানী ঃ লাইলাহাইল্লাহ। তাঁর পরে এ মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন তাঁর পুত্র ইসমাঈল (আ.)।

তাঁদের অন্তর্ধানের পর প্রায় আড়াই হাজার বছর পার হলো। অবিশ্বাস আর পাপের কালো ছায়া ছেয়ে ফেললো পুরো আবরভূমি। অজ্ঞতা, কুসংস্কার, নরহত্যা, রাহাজানি, অবিচার, অনাচার, ব্যভিচারের আবিলতায় আচ্ছন্ন হলো আরব সমাজ।

তবু এর ভেতরেও হৃদয়ে প্রভু-বিশ্বাসের ক্ষীণ আলোক শিক্ষা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন কেউ কেউ। মক্কার যায়িদ ইবনে আমর সেই বিশ্বাসীদের একজন। তিনি অন্ধকারের মধ্যে থেকেও আরবদের কোন গর্হিত-বিবেকহীন কাজে সামিল হন নি। ঘৃণাভরে বাদ দেন। মূর্তিপূজা, মদ্যপান, কন্যা সন্তান হত্যা– সব কিছুরই প্রতি ছিলো তাঁর চরম বিদ্বেষ। এমন কী, দেব-দেবীর নামে যবাই করা পশুর মাংস খাওয়াকেও মহা পাপের কাজ বলে মনে করতেন তিনি। এ ধরনের মাংস তাঁর সামনে আনা হলে তিনি বলতেন– 'তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবাই করা গোশত আমি খাইনে।'

এক দিনের ঘটনা। যায়িদ কাবার গায়ে পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখলেন কিছু দূরে অনেক মানুষের ভিড়। কুরাইশরা কোন একটি উৎসব পালন করছে। মেতে উঠেছে সবাই। নারী-পুরুষ, শিশু, কিশোর– সবাই। পুরুষেরা মাথায় বেঁধেছে দামী রেশমী পাগড়ী, গায়ে জড়িয়েছে মূল্যবান ইয়েমেনী চাদর। নারীরা পরেছে মূল্যবান পোশাক ও অলঙ্কার। শিশু-কিশোররাও সুন্দর সাজে সজ্জিত। ধনী লোকেরা তাদের গৃহপালিত পশুদের হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বেদীর দিকে। দেব-দেবীর নামে বলি দেবে তাদের।

যায়িদ বেশ কিছু সময় ধরে এ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। পর্যবেক্ষণ করলেন গভীর ভাবে। তারপর বললেন– 'হে কুরাইশ গোত্রের

www.pathagar.com

লোকেরা! এই পশুগুলো সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষন করে তাদের পানি পান করান, যমীনে ঘাস সৃস্টি করে তাদের আহার করান। আর তোমরা অন্যের নামে সেগুলো যবাই কর? আমি তোমাদের একটি মূর্খ সম্প্রদায় রূপে দেখতে পাচ্ছি।'

পাশেই ছিলেন তাঁর চাচা, ওমরের (রা.) পিতা খাত্তাব। ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। রাগের সাথে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন যায়িদের গালে। তারপর বললেন– তোর সর্বনাশ হোক। আমরা সব সময় তোর মুখ থেকে এ ধরনের বাজে কথা শুনে আসছি। এখন আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

তারপর তিনি যায়িদকে দমন করতে উঠে পড়ে লাগলেন। দুষ্ট লোকদের লাগিয়ে দিলেন তাঁর পেছনে। তারা নানা ভাবে কষ্ট দিতে লাগলো তাঁকে। বাধ্য হয়ে তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন। আশ্রয় নিলেন হেরা পর্বতে গিয়ে। তাতেও ক্ষান্ত হলেন না খাত্তাব। একদল কুরাইশ যুবককে নিয়োগ করলেন তাঁর প্রতি সব সময় সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য। যাতে তিনি গোপনে মাক্কায় প্রবেশ করতে না পারেন।

এমনি প্রতিকুল অবস্থায়ও আরেকবার মক্কায় ফিরে আসতে চাইলেন তিনি। কয়েকজন বিশ্বাসী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। একদিন চলেও এলেন গোপনে। দেখা করলেন ওয়ারাকা বিন নওফেল, আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ, ওসমান বিন হারিস প্রমুখ বিশ্বাসীদের সাথে। জানালেন তাঁর অটুট বিশ্বাসের কথা ঃ

– আল্লাহর কসম! আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখুন, আপনাদের এ জাতি কোন ভিত্তির ওপরে নেই। তারা দ্বীনে ইব্রাহীমকে বিকৃত করে ফেলেছে। তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। আপনারা যদি মুক্তি চান, নিজেদের জন্য একটি দ্বীন অনুসন্ধান করুন।'

তারপর খাঁটি দ্বীনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন চার জন– ওয়ারাকা, আব্দুল্লাহ, ওসমান ও তিনি। গেলেন নানা জায়গায়। নানা ধর্মগুরুদের কাছে। ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম গুরুদের কাছে। ইহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে জানলেন, বুঝলেন।

www.pathagar.com

ওয়ারাকা বিন নওয়েল খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন। আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ ও ওসমান বিন হারিস কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলেন না। আর যায়িদ ইবনে আমরের কোন ধর্মেই মানসিক তৃপ্তি এলো না।

তাই তিনি ঘুরতে লাগলেন নানা দেশে, নানা জায়গায়। এক সময় গিয়ে পৌঁছালেন সিরিয়ায়। সেখানে থাকতেন সংসার ত্যাগী এক খৃষ্টান পাদরী। তাঁর কাছেই ব্যক্ত করলেন তাঁর ব্যথাতুর হৃদয়ের বক্তব্য।

– হে মক্কাবাসী ভাই, আমার মনে হয় আপনি দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসন্ধান করছেন। বললেন পাদরী।

– হ্যাঁ।

– আপনি যে দ্বীনের সন্ধান করেছেন, আজকের দিনে তা তো পাওয়া যায় না। তবে সত্য তো আপনারই শহরে। আল্লাহ আপনার বংশে এমন এক ব্যক্তি পাঠাবেন যিনি দ্বীনে ইব্রাহীমকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাঁকে পান, তাঁর অনুসরণ করবেন। বললেন পাদরী।

খৃষ্টান পাদরীর কথা শুনে আর এক মুহূর্তও দেরী করলেন না যায়িদ। দ্রুত মক্কার পথে পা চালালেন। তিনি যখন মক্কার থেকে বেশ কিছু দূরে, তখনই সত্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন মুহাম্মদ (সা.)। কিন্তু তাঁকে অনুসরণ করার সৌভাগ্য হলো না যায়িদের। একদল মরুদস্যু আক্রমন করলো তাঁকে। তাদের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন তিনি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন– 'হে আল্লাহ, যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমার পুত্র সাঈদকে তা থেকে মাহরুম করবেন না।'

সাঈদ তখন উনিশ বিশ বছরের যুবক। একদিন হঠাৎ শুনলেন, মক্কায় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ এক নতুন ধর্ম প্রচার করছেন। এ ধর্মের সার কথা হলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কোন এলাহ নেই। তিনিই সবকিছুর একচ্ছত্র অধিপতি, মালিক। কুরাইশদের মধ্যে তাঁর এ তাওহিদী মতবাদ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে উচ্চ-অনুচ্চ স্বরে। ইতোমধ্যে এ ধর্ম গ্রহণও করেছেন মক্কার কযেকজন উত্তম চরিত্রের মানুষ।

www.pathagar.com

সাঈদেরও এ আলোর মিছিলে আসার ইচ্ছে হলো। আর এটাই ছিলো স্বাভাবিক। কেননা তিনি তো আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী যায়িদ বিন আমরেরই সন্তান। প্রতিপালিত হয়েছেন সেই পিতার তত্ত্বাবধানে। যে পিতা কুরাইশদের সকল জাহেলী কর্মকাণ্ডকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করেছিলেন, প্রতিবাদ করেছিলেন আজীবন। পিতার এমনি মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল সাঈদের মধ্যেও । তাই তো তিনি নবী মুহাম্মদকে (সা.) স্বাগত জানালেন। গ্রহণ করলেন আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম। তাঁর সহধর্মিনী, খাত্তাবের কন্যা, ফাতিমাকে সাথে নিয়ে।

তাঁদের দু'জনেরই ওসিলায়, কিছু দিন পরেই, আল্লাহ ইসলামের ছায়াতলে এনে দিলেন কুরাইশ বংশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ওমর বিন খাত্তাবকে (রা.)। আর তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রইলো চিরকাল।

www.pathagar.com

হযরত বেলাল ইবনে রাবাহ (রা.)

খাঁচায় বন্দী থাকতে চায় না পাখি। সে আকাশের নীলিমায় হারিয়ে যেতে চায়। তাই সে ডানা মেলে উড়ে। ক্লান্ত হয়ে আবার ফিরে আসে নিজের বানানো বাসায়। সঙ্গিনীর সাথে বাস করে স্বাধীন হয়ে– জন্ম দেয় পক্ষী শাবকের। পরবর্তী প্রজন্মের পাখিরা কেউ আর পরাধীন থাকতে চায় না– তারা হয়ে ওঠে স্ব-নির্মিত বাসভূমিতে স্বাধীন, মুক্ত। তার স্বকীয় জীবনের একমাত্র মালিক তো নিরাকার প্রভু। কোন জীব তো তার প্রভু হতে পারে না।

ঊষর মরুর কোলে দিনে দিনে বড় হয়ে ওঠা আজন্ম ক্রীতদাস তরুণ বেলালের মনেও এ ভাবনা জাগে। হাবশার ক্রীতদাস রাবাহ-হামামার আদরের দুলাল বেলাল জন্ম নিয়েছিলেন দাস হিসেবে। তাঁর জনক-জননী সামান্য কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি হয়েছিলেন মক্কার কুরাইশ বংশের জুমহা গোত্রের খলফের কাছে।

দাসের ছেলে দাস হবে, মনিবের ছেলে মনিব হবে– এই ছিলো সমকালীন আরব সমাজের রীতি। তাই রাবাহ-হামামার মৃত্যুর পর তাদের ছেলে বেলালও গোলাম হলেন খলপের। এক সময় খলফও মারা গেলো। তখন বেলালের মালিক হলো উমাইয়া বিন খলফ।

খলফ একেবার হৃদয়হীন ছিলো না। তার মধ্যে কিছুটা দয়া-মায়া ছিলো। তাই তার সময়ে বেলালের তেমন কষ্ট ছিলো না। কিন্তু উমাইয়া বড়ই নির্মম, নিষ্ঠুর। কোন মায়া-মমতা নেই তার দিলে। সে বেলালকে সব সময় হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটায়। তাতেও মন ভরে না তার। অকারণে বেলালকে মারধর করে, আঘাত করে।

বেলাল বুঝতে পারেন জন্মসূত্রে তিনি দাস। আর এ থেকে অব্যহতি পাবার উপায় নেই। মুক্ত জীবনের সুবাতাসের স্পর্শ নিতে তাঁর শরীরে শিহরণ জাগে। বিশ্বজগতের নিয়ন্তা সেই একক প্রভুর ভাবনা আসে। তাঁকে চেনার জন্য এসেছেন বিশ্বনবী (সা.)– যিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। এই

www.pathagar.com

সঞ্জিবনী সংবাদ পৌঁছে গেছে অনেক জায়গায়। তাঁর মালিক উমাইয়াও পেলো। সে অস্বীকার করলো নবুয়তের চিরায়ত বাণী। তাই তো পরিবারের সবাইকে সাবধান করে দিলো মুহাম্মদের (সা.) দলে না ভিড়তে। যে ভিড়বে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

বেলাল জানেন কতো নৃশংস আর নিষ্ঠুর তাঁর মালিক। তার অবাধ্য হওয়া অর্থ শরীরে নির্মম আঘাত; যাতে মৃত্যুও অনিবার্য হতে পারে। কিন্তু কালো মানুষের মতো তাঁর অন্যকিছু তো কালো নয়। শরীরের রক্ত লাল, তেমনি হৃদয়ে যে শুভ্র সত্য লালন করেছেন বেলাল তা তো চিরসত্য, শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন। পরম প্রভু-পালিয়তায় বিশ্বাস আর বাণী বাহকের অমৃত-আহবানকে কীভাবে অস্বীকার করা যায়! তা কী সম্ভব! বেলালের মানস-ভাবনা ও শক্তি তাঁকে পরম বিশ্বাসের দ্বারে উন্নীত করলো। উত্তরণ ঘটলো এক অভাবনীয় প্রাপ্তির। পরম প্রভুর নিরাপত্তার ছায়ায় আশ্রয় নিলেন তিনি। একক প্রভুর নবীর কালেমা তাই তিনি গ্রহণ করলেন গভীর মগ্নতায়, পরিশুদ্ধ চিত্তে, অনুরণনে ঃ 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

বেলাল চেয়েছিলেন তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটা গোপন রাখতে। কিন্তু তা পারলেন না। জেনে ফেললো অনেকেই। তাঁর মালিক উমাইয়ার কানেও গেলো কথাটা। রাগের আগুনে উত্তপ্ত হতে লাগলো তার অবিশ্বাসী অন্তর। কিছুতেই তা মেনে নিতে পারলো না সে। তখনই তলব করলো বেলালকে (রা.)।

– ইসলাম গ্রহণ করেছিস তুই? রোষের সাথে জিজ্ঞেস করলো উমাইয়া।

– হ্যাঁ, আমি সত্য ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। অকপটে জবাব দিলেন বেলাল (রা.)।

– নরাধম! এতবড় সাহস তোর! কোন সাহসে তুই মুহাম্মদের (সা.) ধর্ম গ্রহণ করলি? তুই কি জানিস না এর পরিনতি কত ভয়াবহ?

– আমি অনেক ভেবে চিন্তেই এ পথে পা দিয়েছি। এ ছাড়া মুক্তির কোন পথ আমি পাই নি। আপনাকেও পরামর্শ দিচ্ছি, দেরী না করে আপনিও এ পথে ফিরে আসুন।

বেলালের কথাগুলো কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটার মতো লাগলো উমাইয়ার। সে আর সহ্য করতে পারলো না। সাথে সাথে চাবুক মারতে লাগলো

www.pathagar.com

বেলালকে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হতে লাগলেন বেলাল। রক্তাক্ত হতে লাগলো তাঁর কোমল দেহ। এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়লো উমাইয়া। তখন সে বেলালের গলায় দড়ি বেঁধে তুলে দিলো দুষ্ট ছেলেদের হাতে। তারা মনের উল্লাসে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো তাঁকে। ক্ষত-বিক্ষত হলো তাঁর দেহ। অঝোরে রক্ত ঝরলো সারা শরীরে।

দুষ্ট ছেলেরা টেনে হেঁচড়ে দুপুরের দিকে অর্ধমৃত বেলালকে উমাইয়ার কাছে ফেরত দিলো। তাঁর সামনে পড়ে থাকা বেলালের ক্ষত-বিক্ষত আসাড় দেহ দেখে কুটিল হাসিতে ফেটে পড়লো সে।

রাতে আবর্জনাপূর্ণ দুর্গন্ধময় এক ঘরে গলায় রশি বেঁধে বেলালকে রাখলো সে। তাঁকে খাদ্য পানীয় কিছুই দিলো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হলেন তিনি। এতো কষ্টের মধ্যেও প্রভুর স্মরণ তাঁকে অবিচল রাখলো। সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারলো না।

এভাবেই প্রতিদিন চলতে থাকে বেলালের ওপর অমানুষিক নির্যাতন। দিনের বেলায় গলায় রশি বেঁধে বখাটে ছেলেদের হাতে তুলে দেয়া হতো। তারা তাঁকে মক্কার পথে পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে উল্লাস করতো। দুপুরের দিকে লোহার পোষাক পরিয়ে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে রাখা হতো। উত্তাপে তেতে উঠতো লোহার পোষাক। অস্থির হয়ে পড়তেন বেলাল (রা.)। এ সময় উমাইয়া কাছে এসে তাঁকে ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দিতো। জবাবে বেলালের মুখ দিয়ে শুধু বের হতো– 'আহাদ আহাদ।'

www.pathagar.com

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত (রা.)

নবুয়তের কয়েক বছর আগের ঘটনা। মক্কার কাছাকাছি বসেছে বিরাট এক হাট। এখানে বিকিকিনি হবে গোলাম-বাঁদী। ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। আজীবন গোলাম-বাঁদী হয়ে পশুর মতো অর্থের বিনিময়ে হাত বদল হবে মরু মুলুকের কিছু ভাগ্যহীন মানুষ। সারা আরব থেকে বিপুল পরিমান ক্রেতা-বিক্রেতা এসেছে এ হাটে। এসেছে মক্কার ধনবতী মহিলা উম্মে আনমারও। একটি ভাল গোলাম দরকার তার। যে গোলাম হবে সৎ, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ। যে তার খেদমত করবে, সংসারের সব কাজ করবে, অর্থ উপার্জন করে দেবে।

উম্মে আনমার হাটে এসেছে অনেকক্ষণ। আসা অব্দি শুধু ঘুরে ঘুরে দেখছে সে। হাটের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। যাচ্ছে প্রতিটি গোলামের পাশে। কিন্তু কাউকে যেনো মনঃপূত হচ্ছে না তার। ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এক কিশোর বালকের পাশে এসে দাঁড়ালো সে। বিচক্ষণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সততা, কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ ছেলেটির চেহারায়। তাকে খুব পছন্দ করলো উম্মে আনমার। তাই তাকে কিনে নিলো উপযুক্ত দাম দিয়ে। তারপর ফিরে চললো বাড়ির পথে।

চলছে উম্মে আনমার। সঙ্গে তার সদ্য কেনা গোলামটি। তাদের আগে-পিছে যাচ্ছে আরো অনেক মানুষ। মক্কার বালুময় পথ। চলাচলে কষ্ট। সবাই ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত। কিন্তু উম্মে আনমারের যেনো কোন ক্লান্তি নেই। তার সব ক্লান্তি দূর করেছে ছেলেটির ভাবনা। সে তাঁর সম্পর্কে ভাবছে অনেক কিছু ঃ 'কেমন সুন্দর ছেলে! কেমন মায়াভরা চেহারা। আভিজাত্যের আবির ছড়ানো সারা শরীরে। বড় ঘরের ছেলে বলে মনে হয়। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য ছেলেটির!'

উম্মে আনমার হাঁটছে আর ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে তার দিকে। কেমন যেনো মায়া হচ্ছে তার ছেলেটির প্রতি। ছেলেটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করে তার। এক সময় কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো ঃ

– শুনলাম, তোমার নাম খাব্বাব।

www.pathagar.com

– জী হ্যাঁ, খাব্বাব ইবনে আরাত।

– বাড়ি কোথায় তোমার?

– নজদে

– নজদে! কিন্তু তোমার এ পরিনতি কেন?

– সে এক করুণ কাহিনী।

– আমি শুনতে চাই সে কাহিনীর বিষয়।

– জন্ম আমার নজদের তামীম গোত্রে। সেখানকার অন্যান্য বালকের সাথে আমিও খেলতাম। বাবা-মা-ভাই-বোন-প্রতিবেশীদের সান্নিধ্যে আমার দিন পার হতো। রাত্রি নামতো। কিন্তু এর মধ্যে ঘটে গেলো এক অঘটন। এক আরব দস্যুর দল আক্রমন করলো আমাদের গোত্র। তারা নির্বিচারে হত্যা করলো পুরুষদের, বন্দী করলো নারী ও শিশু-কিশোরদের। আমিও বন্দী হলাম দাস হিসেবে। শেষ পর্যন্ত এখানে এসে আপনার হাতে এলাম। এই আমার সংক্ষিপ্ত কিশোর জীবনের করুণ কাহিনী। জানিনা এরপর আর কী আছে আমার ভাগ্যে।

– তুমি আমার হাতে এসে পড়েছো। তাই তোমার ভাগ্য ভাল। চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি সন্তান স্নেহে প্রতিপালিত হবে আমার কাছে। খাব্বাবের গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললো উম্মে আনমার।

উম্মে আনমারের বাড়ি ক্রীতদাস হয়ে এলেন খাব্বাব। খাটতে লাগলেন তার ফাইফরমাশ। যে কোন কাজই বলা মাত্র করে ফেলেন তিনি। তাঁর খেদমতে উম্মে আনমারও খুব খুশী। এ রকম একটি কর্মঠ ও কর্তব্য-নিষ্ঠাবান ক্রীতদাসই সে চেয়েছিল। যাকে দিয়ে অর্থ উপার্জনসহ সব কিছু করানো যাবে।

– খাব্বাবকে কামারের কাজ শিখাতে হবে। এ কাজে উপার্জন সবচে' বেশী। ভাবলো উম্মে আনমার।

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। কয়েক দিনের মধ্যে খাব্বাবকে কামারের কাজ শিখতে পাঠালো সে। মক্কার এক বিখ্যাত কামারের কাছে। মনন, মেধা, শক্তি, সাহস– সবই প্রবল ছিলো খাব্বাবের। তাই মোটেই সময় লাগলো না

www.pathagar.com

তাঁর। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে পুরোপুরি শিখে ফেললেন কঠিন ও কষ্টসাধ্য কর্মকারের কাজ। তারপর কাজ করার জন্য বানালেন একটি কর্মশালা।

মক্কা নগরীর এক নির্জন প্রান্তে দাঁড়িয়ে এক পর্ণকুটির। এটাই কিশোর কামার খাব্বাবের কর্মশালা, দোকান। এখানে বসেই রাত-দিন কাজ করেন তিনি। উন্নতমানের তরবারি তৈরী করেন। যা পছন্দ করে সকলেই। তাঁর বানানো তরবারি কিনতে দূর-দূরান্ত থেকে তাই লোকেরা ছুটে আসে তাঁর দোকানে। খাব্বাবও খুব উৎসাহিত হন। কদর করেন ক্রেতাদের। বসতে দেন সযত্নে। সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। অবশেষে তরবারি দেন ওয়াদা মতো।

সারাদিন বিরামহীন কাজের পর ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন খাব্বাব। তখন তিনি চলে যান নির্জন পাহাড়ের কোলে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখে পরিতৃপ্ত হন। কী সুন্দর প্রকৃতি! নীরব-নিঃসীম নীল আকাশ। তাতে সাদা মেঘের ভেলা। যেনো ডানা মেলে উড়েছে। কী সুন্দর খেজুর গাছের সারি! তাতে নানা রকম পাখ-পাখালির সুমধুর কাকলি। কে সৃষ্টি করেছেন এসব? কে সেই মহান কারিগর? শুধু ভাবেন খাব্বাব। একসময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আবার দোকানে ফিরে আসেন তিনি।

দিন যায়। কাজের মধ্যে সময় পার হয় খাব্বাবের। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন একটি গোপন সংবাদ। মক্কার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ নবুয়ত পেয়েছেন। তিনি বলছেন, দেব-দেবী সব মিথ্যা। একমাত্র আল্লাহই সব শক্তির উৎস। সকল ক্ষমতার মালিক। তিনি লা শরীক। তাঁর কোন শরীক নেই।

আনন্দে নেচে উঠলো খাব্বাবের মন। এতোদিনে মনের আশা পূর্ণ হলো তাঁর। সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছেন তিনি। এতো মানবের মুক্তির একমাত্র পথ। আর যিনি এ পথের দিশারী তিনি তো সর্বোত্তম মানুষ। অনুপম তাঁর চরিত্র মাধুরী। সত্যবাদিতা তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তো সবাই তাঁকে বলে আল-আমীন।

হেদায়াতের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে উঠলো তাঁর হৃদয়দেশ। চুপে চুপে নবীর (সা.) কাছে চলে এলেন তিনি। তাঁর পবিত্র হাতে হাত রেখে উচ্চারণ করলেন বিশ্বাসের বানী ঃ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

www.pathagar.com

খাব্বাব (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন না। প্রকাশ করলেন নিঃসংকোচে। শুনে ফেললো অবিশ্বাসীরা অনেকেই। তাঁর মালিক উম্মে আনমারও। ক্রোধে গর্জে উঠলো সে।

– কী, এই পুচকে গোলামের এতো বড় দুঃসাহস! এক্ষুনি দেখাচ্ছি মজা।

উম্মে আনমার তখনই তার ভাই সিবা ও আরো কয়েকজন অবিশ্বাসীকে সাথে নিয়ে ছুটে গেলো খাব্বাবের দোকানে। সিবা কর্কশকণ্ঠে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো ঃ

– তোর সম্পর্কে আমরা কিছু কথা শুনেছি।

– কি কথা? জিজ্ঞেস করলো খাব্বাব।

– তুই নাকি ধর্মত্যাগ করে বনু হাশিমের ওই যুবকের দলে যোগ দিয়েছিস?

– আমি ধর্মত্যাগ করেনি। লা–শরীক আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি। মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়েছি, মুহাম্মদ (সা.) কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলে মেনে নিয়েছি।

খাব্বাবের (রা.) কথা শুনে যেনো আগুন ধরে গেলো সিবার গায়ে। প্রচণ্ড এক ঘুষির সাথে ঝাপিয়ে পড়লো তাঁর ওপর। সেই সাথে তার সাঙ্গপাঙ্গরাও। কিল-ঘুষি-লাথি মারতে লাগলো অবিরাম। কেউ উত্তপ্ত লৌহ শলাকা ঠেসে ধরলো তাঁর গায়ে। কেউ পা দিয়ে পিষতে লাগলো তাঁকে। এমনি উপর্যুপরি আঘাত সহ্য করতে পারলেন না খাব্বাব (রা.)। টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেলেন। চেতনা হারিয়ে ফেললেন।

এমনি প্রায়ই চলতো তাঁর প্রতি অবিশ্বাসীদের নির্মম নির্যাতন। তবু ইসলাম ত্যাগ করেন নি তিনি। ফিরে যাননি কুফরী জীবনে।

www.pathagar.com

হযরত আবুযর গিফারী (রা.)

ওয়াদ্দান উপত্যকা। মক্কা ও সিরিয়ার মিলন ভূমি। এ উপত্যকা পার হয়েই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যেতো সিরিয়ায়। এখানেই বাস করতো গিফার গোত্রের লোকেরা। যারা ছিলো খুবই দুর্ধর্ষ, নৃশংস। হত্যা ও লুটতরাজ ছিলো তাদের নিত্যদিনের পেশা।

তারা নিরাপত্তা দিতো কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার। এর বিনিময় ছিল অর্থ-সম্পদ। অর্থাৎ কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যাতে আর কারো দ্বারা আক্রান্ত না হয় তার রক্ষার কাজ ছিল তাদের। এমনি করে কোন বানিজ্যিক কাফেলা যখন তাদের দাবী অনুযায়ী অর্থ দিতো অস্বীকার করতো, তখন তারা সেই কাফেলা লুণ্ঠন করতেও দ্বিধা করতো না।

এই দুর্ধর্ষ গিফার গোত্রেই জন্মেছিলেন আবুযর গিফারী (রা.)। বাল্য থেকেই তিনি হয়ে ওঠেন অসীম সাহসী, শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। এ সময়ই তীর-ধনুক ও অস্ত্র চালনায়ও বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন তিনি। যৌবনে গোত্রের রেওয়াজ অনুযায়ী পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন দস্যু-বৃত্তি। করতে থাকেন লুটতরাজ। নানা জায়গায়। কখনো সংঘবদ্ধ হয়ে, কখনো একাকী। অপরিচিত এলাকার পশুপাল বাহুবলে তাড়িয়ে নিয়ে আসেন নিজের বাড়ি। ঘোড়ায় চড়ে একাকী ঘুরে বেড়ান যেখানে খুশী। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। সবাই ভয় পায় তাঁকে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত হিসেবে।

মানুষের মনুষ্যত্ব, মানবিকতা, বিবেক ঘুরে ফিরে আসে। পরিবর্তন আনে তার জীবনের। বিবেক দংশনে জর্জরিত হয়ে খুব খারাপ মানুষও খুব ভালো মানুষে পরিণত হয়। আবুযর গিফারীর ক্ষেত্রে ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এক সময় তাঁরও বিবেক ফিরে এলো। অতীত কৃতকর্মের কথা স্মরণ করে অনুতপ্ত হলেন তিনি।

– এতোদিন একী করলাম আমি? এর পরিনাম কি? সৃষ্টি কর্তা তো একজন আছেন। তাঁর কাছে কি জবাব দেবো?

অনুতাপের আগুনে অঙ্গার হয়ে কলুষিত জীবন ছেড়ে দিলেন তিনি। ফিরে এলেন সৎ পথে। জীবন যাপন করতে লাগলেন সৎভাবে। মূর্তিপূজাসহ সকল পাপকর্ম পরিত্যাগ করলেন। নবুয়তের তিন বছর আগে থেকে

www.pathagar.com

নিরাকার এক আল্লাহর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে তাঁর ইবাদত করতে লাগলেন। ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি জানা ছিলো না তাঁর। তাই নিজের ইচ্ছা মত নামাজ পড়তেন।

এতে গোত্রের লোকেরা ভীষণ ক্ষিপ্ত হলো তাঁর প্রতি। তাঁকে ধর্মত্যাগী বলে আখ্যা দিলো। এমন কি অবরোধ আরোপ করলো তাঁর বিরুদ্ধে।

এমনি অবস্থায়ও মোটেই হতাশ হলেন না আবুযর (রা.)। সামান্যতম চিড় ধরলো না তাঁর বোধ ও বিশ্বাসে। বরং তা আরো দৃঢ় হলো। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আবুযর বুঝতে পারেন, অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা আরব জাতির মুক্তির জন্য একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন। আর তাঁর আগমনের সময়ও অতি নিকটে। তাই অপেক্ষা করতে থাকেন তিনি।

কিছুদিন পরের কথা। তাঁর গোত্রের কয়েকজন লোক গেলো মক্কায়। তারা ফিরে এসে তাঁকে জানালো ঃ

– মক্কায় একজন মহান মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। তিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। তাঁর কথা বার্তার সাথে তোমার বেশ মিল আছে। চমকে উঠলেন আবুযর। তখনই তাঁর ছোট ভাই আনিসকে ডেকে বললেন ঃ

– তুমি একটু মক্কায় যাও। সেখানে যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন, তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করবে, তাঁর মুখের কথা শুনবে। তারপর ফিরে এসে আমাকে জানাবে সবকিছু।

মক্কায় চলে গেলেন আনিস। সাক্ষাত করলেন নবীর (সা.) সাথে। তাঁর মুখের কথা শুনলেন। আচার-আচরণ দেখলেন। তারপর ফিরে এসে আবুযরকে বললেন ঃ

– আল্লাহর কসম! আমি তো লোকটিকে দেখলাম, যিনি মানুষকে এক মহান পথের দিকে ডাকছেন। আর এমন সব কথা বলেন যা কবিতার কল্পনা বলে মনে হয় না। বিশ্বাসের সীমায় যাকে আনা যায়।

– মানুষ তাঁর সম্পর্কে কী বলাবলি করে? জিজ্ঞেস করলেন আবুযর।

– কেউ বলে তিনি একজন যাদুকর, কেউ বলে গণক, আবার কেউ বলে কবি।

– আল্লাহর কসম! তুমি আমার তৃষ্ণা মেটাতে পারলে না। আমার আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হলো না। তুমি কি পারবে আমার পরিবারের দায়িত্ব নিতে যাতে আমি মক্কায় গিয়ে স্বচক্ষেই তাঁর অবস্থা দেখে আসতে পারি?

– নিশ্চয়ই! তবে আপনি মক্কাবাসীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। বললেন আনিস।

www.pathagar.com

পরদিন প্রভাত হলো। মনের অস্থিরতা ও নতুন কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষায় মক্কার পথ ধরলেন আবুযর। সঙ্গে নিলেন সামান্য কিছু খেজুর ও পানি। ভয় আর আকাঙ্ক্ষা কাজ করছিল তাঁর মনে, হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে। না জানি কেউ জেনে ফেলে তাঁর উর্দিষ্ট উদ্দেশ্য, পরিকল্পনা। ভয়ে ভয়ে একসময় মক্কার পৌঁছে গেলেন তিনি।

দিন কেটে গেলো। কারো কাছে নবী মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না তাঁর।

নেমে এলো রাতের আঁধার। তিনি ক্লান্ত ও অবসন্ন। বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন মসজিদুল হারামের এক কোনে। সৌভাগ্যক্রমে আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) যাচ্ছিলেন ওই পথ দিয়ে। আবুযরকে দেখেই বুঝতে পারলেন, লোকটি মুসাফির। তাই তাঁকে ডেকে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ি। রাত কাটলো। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। সাহস হলো না কারো। সকাল বেলায় পানির মশক ও খেজুরের পুটলিটি নিয়ে আবার ফিরে এলেন মসজিদে।

পরের দিন কাটলো। তবে নবীর সাথে দেখা হলো না,পরিচয় হলো না। সন্ধ্যার পর আবারও মসজিদে শুয়ে পড়লেন তিনি। আজও আলী (রা.) যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। তিনি মনে মনে বললেন ঃ

– 'ব্যাপার কী? লোকটি আজও তাঁর গন্তব্য চিনতে পারেনি?

তিনি আবারও তাঁকে সাথে নিয়ে বাড়ি গেলেন। আজ সারা রাতও কেটে গেলো। কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

তৃতীয় রাতেও আলীর (রা.) বাড়িতে মেহমান হলেন আবুযর।

আলী (রা.) আজ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। জিজ্ঞেস করলেন ঃ

– বলুন তো আপনি কি উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন?

– আপনি যদি আমার কাছে অঙ্গীকার করেন আমার কাঙ্ক্ষিত পথ দেখাবেন, তাহলে আমি বলতে পারি।

– নিশ্চয়ই। অঙ্গীকার করলেন আলী (রা.)।

– শুনুন, আমি অনেক দূর থেকে মক্কায় এসেছি, নতুন নবীর সাথে সাক্ষাত করতে। তিনি যেসব কথা বলেন তার কিছু শুনতে, বুঝতে চাই।

আলীর (রা.) মুখের কান্তি আরো উজ্জ্বল হলো। নিরাশার এক গভীর অতলান্ত থেকে যেনো জেগে উঠলো তাঁর মন। উদ্ভাসিত হলো তাঁর মানসপট। তিনি বললেন ঃ

www.pathagar.com

– নিশ্চিত তিনি সত্য নবী। সকালে আমি যেখানে যাই, আপনি আমার সাথে যাবেন। পথে যদি আমি আপনার জন্য আশংকা জনক কোন কিছু লক্ষ্য করি, প্রস্রাবের ভান করে দাঁড়িয়ে যাব। আবার যখন চলবো, আমাকে অনুসরণ করবেন। এভাবে আমি যেখানে প্রবেশ করবো, আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন।

– ঠিক তাই হবে। বললেন আবুযর।

রাত পহালো। মেহমান সঙ্গে নিয়ে নবীর (সা.) বাড়ির দিকে চললেন আলী (রা.)। পথে কোন কিছুর দিকে নজর দিলেন না তাঁরা। পৌঁছে গেলেন নবীর পূত পবিত্র সান্নিধ্যে। নবীজীকে দেখেই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ হলো আবু যরের তৃষিত অন্তর। সশ্রদ্ধ সালাম জানালেন তাঁকে।

– আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ।

– ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ।

আবুযর এভাবে প্রথম ইসলামী কায়দায় আল্লাহর নবীকে (সা.) সালাম জানালেন। আর তা সালাম বিনিময়ের রেওয়াজ হয়ে রইলো চিরকাল।

মহানবী (সা.) আবুযরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। পবিত্র কুরআন থেকে কিছু আয়াতও তেলাওয়াত করে শুনালেন। আবুযর আর এক মুহূর্ত ও দেরী করলেন না। সেখানে বসেই প্রিয় নবীর (সা.) হাত ধরে কালেমায়ে তাওহীদ পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করলেন। পরিতৃপ্ত ও উদ্ভাসিত হলো তাঁর অন্তর।

ইসলামে আলিঙ্গনের পর আবুযর (রা.) এলেন হেরেমের পাদদেশে। উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ

– হে কুরাইশরা! তোমরা ভুল পথে আছো, ভুল তোমাদের আজীবন লালিত বিশ্বাস। মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসূল। তাঁকে মেনে নাও। মহান একক সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে ওঠো। পাঠ করো কালেমার অমিয় বাণী।

এ কথায় রাগান্বিত হলো কুরাইশরা। তারা আবুযরকে (রা.) আক্রমন করলো। মারলো বেধড়ক। অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন তিনি।

এ সময়ে সেখানে হাজির হলেন আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। তাঁকে অচেতন অবস্থায় দেখে বললেন ঃ

– তোমরা কাকে মেরেছো? এ কে তোমরা জানো? এ তো গিফার গোত্রের তরুণযুবক। যারা তোমাদের সিরিয়ার বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তা দেয়।

এ কথায় অবাক ও ভীত বিহবল হয়ে পড়লো কুরাইশরা।

www.pathagar.com

Ahsan Publication
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com